দি গিল্টি আর অ্যাফ্রেড

জেমস হেডলি চেজ

BENGALIEBOOK.COM ★2022★

সূচিপত্র

সোনালী চুলের পুতুল 2

ফ্রাঙ্কলিন অ্যাপার্টমেন্ট 62

তৃতীয় ঘর....................120

সোনালী চুলের পুতুল

০১.

সেন্ট রাফাইল সিটি স্টেশনের বাইরে পা রাখতেই নজর কেড়ে নেয় সোনালী চুলের পুতুল পুতুল মেয়েটি। পরনে সাঁতারুর বিকিনি। চোখে মস্ত রোদ-চশমা। মাথা ঢেকেছে বিশাল খড়ের টুপি, আঁটো শরীরের ত্বক কোমল, মসৃণ শক্ত ছাদের ক্যাডিলাকে উঠতে কিছু সময় নেয় মেয়েটি।

ভঙ্গি যেন বলে-ওগো পুরুষ, মেটাও নয়ন তৃষ্ণা তোমার। আমারও দৃষ্টি আছড়ে পড়ে ওইখানে।

চালকের আসনে বসে রমনী। ভঙ্গিতে অহঙ্কার। একবার চতুর্দিকে চেয়ে দ্যাখে তার কৃপাপ্রার্থী পুরুষ সাম্রাজ্য। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে গাড়ি। যেতে যেতে চোখের কোণায় আমায় দিয়ে যায় অভিসারের নির্ভুল আমন্ত্রণ। আমার মালপত্রবাহক কুলি বলে-ভাড়া গাড়ি লাগবে বাবু?

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখে বুলিয়ে নিয়ে বললাম-লাগবে।

সকাল সাড়ে দশটায় সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে। স্টেশন থেকে স্রোতের মত ধেয়ে আসে অগণিত মানুষ। বাইরে অপেক্ষারত মোটর, ভাড়াগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি...। আশাকরি, জ্যাক নিশ্চয়ই হোটেলে আমার জন্য ঘর বুক করে রেখেছে।

একটা গাড়ি এসে থামতে কুলি আবার মালপত্র তুলে দিল। তাকে বকশিস দিয়ে গাড়িতে উঠে। বললাম–হোটেল অ্যাদে ফি চলুন।

গাড়ি ছুটছে যানজট ছাড়িয়ে, রাস্তাটি সমুদ্রাভিমুখী। দু–পাশে সুদৃশ্য দোকানপাট। পামগাছের সারি। ইউনিফর্মধারী পুলিশ। হু হু করে ছুটে যাচ্ছে মস্ত ক্যাডিলাক। দুরন্ত মানুষ যান।

লাল আলোর সংকেতে গাড়ি থামে। জানলা দিয়ে দেখি, স্বাস্থ্যবতী রমনীরা চলেছে। অধিকাংশের পরণে সাঁতারের পোশাক। কেউ কেউ পাজামা কিম্বা খাটো প্যান্ট পরেছে। আবার কারো পরণে ফ্রেঞ্চীয় সাঁতার বিকিনি, বেশীরভাগই স্থূলকায় মধ্যবয়স্কা রমনী। আঁটো পোশাকে স্পষ্ট তাদের স্তনবৃন্ত। জানলার বাইরে মুখ রেখে থুতু ফ্যালে ড্রাইভার। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বলে–দেখেছেন, যেন শনিবারের হাট।

জায়গাটা বেশ শহর শহর।

–তাই ভাবছেন? একবর্ণ মিথ্যে বলবো না। জানেন, পৃথিবীর যে কোনো শহরের চেয়ে ঢের বেশী ধনী লোক বাস করে এখানকার দু–মাইলের মধ্যে।

স্বীকার করলাম, কথাটা জানা ছিল না। ইশ, যদি সঙ্গে আরো ডলার নিয়ে আসতাম। জ্যাকের কাছে ধার চাওয়া বৃথা।

সমুদ্রকে পিছনে রেখে খাড়াই পাহাড়ি পথ ধরে গাড়ি ছুটছে। দু-পাশে দ্রুত অপসৃয়মান কমলালেবুর গাছ আর রুক্ষ কঠিন পথ। আর কিছুক্ষণ পর গাড়ি থামলো কাঙিক্ষত হোটেলে।

বেজায় মোটা রিসেপশন ক্লার্ক দেতো হাসি হেসে খাতা কলম এগোলেন রিজার্ভেশন আছে নাকি স্যার?

–আশা করি। আমার নাম লিউ ব্রান্ডন। মিস্টার সিপ্পি কি আপনাকে বলেছেন আমি আসছি?

–অবশ্যই মিস্টার ব্রান্ডা, ওনার ঘরের পাশেই আপনার ঘর।

টেবিলে–ঘণ্টার বোয়ামে আঙুল রাখতেই ঘণ্টা বাজে। ছুটে আসে বয়। তিনি নির্দেশ দেন–মিস্টার ব্রান্ডনকে দুশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর ঘরে নিয়ে যাও।

ফের বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে বলেন, মিস্টার সিপ্পি আছে দুশো সাতচল্লিশে। মিস্টার ব্র্যান্ডন এখানে খুব আরামে থাকবেন। আপনাদের সেবার জন্যই তো আমরা...

–ধন্যবাদ, মিস্টার সিপ্পি কি ঘরে আছেন?

–না ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়েছেন, সঙ্গে এক যুবতী।

এডউইন হাসে, সেই সঙ্গে চোখ মটকে আরো যুক্ত করেন–বোধহয় সমুদ্রতীরে গেছেন।

শুনে আশ্চর্য হলামনা, জানি মেয়েদের প্রতি তার অসীম দুর্বলতা। বললাম, ফিরে এলে বলবেন, আমি এসেছি ও ঘরে আছি।

–তাই বলবো মিস্টার ব্রান্ডন। এলিভেটারে দু–তলা টপকে উঠে এলাম। দুশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর, ইঁদুর কলের মত ঘুপচি ঘর। জ্বলন্ত চুল্লির উষ্ণতা ঘর জুড়ে। খাট এত ছোট শুলে পা বেরিয়ে থাকবে। জানলা দিয়ে কিছুই দেখা যায় না।

ভাড়া বেশ সস্তা। এই যা ভরসা।

হোটেল বয় আমার মালপত্র রেখে গেছে। রুম সার্ভিসকে ডেকে অর্ডার দিলাম বরফ আর ডাব সিক্সটি নাইন। তারপর পোষাক ছেড়ে বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার খুলে দিলাম। ঝরণার নিচে যতক্ষণ স্নাত হচ্ছিলাম, ভালো লাগছিল। বেডরুমে এসে ঘামছি।

এক পেগ স্কচ পান করে ফের ঝরণার তলায় এসে দাঁড়াই। এমন সময় দরজায় ধাক্কার শব্দ। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে এসে দরজা খুললাম। দীর্ঘকায় লালমুখো এক ভদ্রলোক। নাকে পুরোনো ক্ষতের দাগ, চোখে জিজ্ঞাসা অথবা সন্দেহ। সর্বাঙ্গে পুলিশি ছাপ। ঘরে ঢুকে দরজা ভেজালেন, –আপনার নাম ব্র্যান্ডন? স্বরে গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব।

হ্যাঁ, কি প্রয়োজন?

ওয়ালেট খুলে পরিচয়পত্র দেখলে–সার্জেন্ট ক্যানডি হোমিসাইড।

তারপর প্রশ্ন করেন জ্যাক সিপ্পিকে চেনেন?

–চিনি। উনি কি কোন ঝামেলায় পড়েছেন?

বলতে পারেন। দেখলে চিনতে পারবেন?

অজানা আশঙ্কা চারিয়ে যায় আমার মধ্যে। কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তো?

–হি ইজ ডেড। হ্যাঁ, উনি মারা গেছেন। নিন, চটপট তৈরী হয়ে নিন, বাইরে আমার গাড়ি আছে। লেফটেন্যান্ট আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

–ডেড? লালমুখো সার্জেন্টের দিকে তাকাই কি হয়েছিল?

চওড়া দুটি কাঁধ ঝাঁকাল ক্যানডিসেকথা লেফটেন্যান্টের মুখ থেকেই শুনবেন। চলুন যাওয়া যাক।

দ্রুত জামাকাপড় পরে, চুল আঁচড়ে মোজা জুতো পরে তৈরী হয়ে নিলাম। আমার হাত দুটোর মৃদু কাঁপন টের পাচ্ছি। জ্যাক আর আমি বেশ ছিলাম। জীবনের উত্তেজনায় প্রাণের উচ্ছলতায় টগবগ করে ফুটতে সে, প্রতিটি মুহূর্তকে যেভাবে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে আমি সেভাবে কখনো করিনি। জ্যাক মারা গেছে। না, এ অসম্ভব।

জুতোর ফিতে বেঁধে আরেক পেগ হুইস্কি গলায় ঢেলে বললাম–খাবেন?

ইতস্ততঃ করে ক্যানডি, একজোড়া পুরু ঠোঁটের ফাঁকে উচ্চারিত হয়–বেশ, বাস্তবিক এখন আমি ডিউটিতে নেই। গ্লাসে বড় করে ঢেলে এগিয়ে দিলাম। তা জলের মত এক নিঃশ্বাসে পান করেন তিনি। তারপর বলেল–চলুন, লেফটেন্যান্ট দেরী মোটেই পছন্দ করেন না। এলিভেটরে নিচে নামলাম। রিসেপশনের হোঁৎকা ক্লার্ক বিস্ফারিত চোখে দেখছেন। সম্ভবতঃ ভাবছেন, আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেতের চেয়ারে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। বৃদ্ধ বললেন ঐ লম্বা চওড়া, লোকটা পুলিশ ছাড়া আর কিছু নয়।

অপেক্ষারত গাড়িতে উঠে চালকের আসনে বসলেন ক্যানডি, আমি পাশে বসলাম। হোটেল চত্ত্বর ছেড়ে বড় রাস্তায় পড়লাম। হঠাৎ প্রশ্ন করলাম–কোথায় তাকে পাওয়া গেছে?

সমুদ্রতীরে। চিউয়িংগাম চিবুতে চিবুতে ক্যানডি জানালেন, ওখানে সারি সারি কেবিন ভাড়া পাওয়া যায়। তারই একটিতে দারোয়ান তাকে পেয়েছে।

হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু না অন্য কিছু?

তাকে খুন করা হয়েছে।

বিহ্বলতা–আঘাত–শাক সব মিশিয়ে আমার মধ্যে কেমন ভাঙচুর হতে থাকে। হাঁটুর নিচে দু–হাত চেপে উত্তেজনা প্রশমিত করতে চেষ্টা করি। আর আমার কিছু বলার নেই। বাইরে তাকিয়ে রইলাম। ক্যানডি গুনগুন করে সুর ভজছেন। আধ ঘণ্টায় সমুদ্র সৈকতে পৌঁছে গেলাম। সমুদ্রতীর বরাবর সমান্তরাল চওড়া রাস্তা ধরে পার্কিং জোনের ছোট্ট

জায়গায় এসে থামলাম, এখান থেকে দেখা যায় পাম গাছের ছায়া ঘেরা নির্জন লাল সাদা সারিবদ্ধ কেবিন। ইতিউতি রঙীন ছাতা মেলা। পার্কিং লনে চার–চারটে পুলিশের গাড়ি ও জ্যাকের কনভার্টেবল বুইক। আমি আর জ্যাক যেটা কদিন আগে কিনেছি। সেকেন্ডহ্যান্ড, এখনো এজন্য ডলার গুনতে হচ্ছে।

দূরের এক কেবিনে দুশো মানুষের ভিড়।

কৌতূহলী মানুষের ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাই। কেবিনের কাছাকাছি যেতে ক্যানডি জানান– ঐ বেঁটে ভদ্রলোক হলেন লেফটেন্যান্ট র‍্যানকিন।

আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন র‍্যানকিন। ক্যানডির চেয়ে অনেক খাটো। পরনে হালকা ধূসর স্যুট, মাথার টুপি ডান চোখে ঈষৎ নামানো। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। শক্ত মুখে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা।

ক্যান্ডি বলেন, ইনিই লিউ ব্রান্ডন।

র‍্যানকিন আমার দিকে দেখেন। চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। পকেটে থেকে একটা কাগজ বের করে দেখেন–আপনি এটা পাঠিয়েছেন?

কাগজটার দিকে তাকাই। এটা সেই টেলিগ্রাম যাতে আমার আসার কথা জ্যাককে জানিয়ে ছিলাম।

বললাম হ্যাঁ।

–উনি কি আপনার বন্ধু ছিলেন?

আমরা দুজনে মিলে ব্যবসা চালাই। উনি আমার পার্টনার ছিলেন।

বহুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে দাঁতে দাঁত ঘষেন র‍্যানকিন বন্ধুকে ভাল করে দেখে নিন। তারপর কথা হবে।

উষ্ণ বালিয়াড়ি মাড়িয়ে তার সঙ্গে কেবিনে ঢুকলাম।

বিচ্ছিরি মুখের দুজন লোক জানলার কোণে কোণে গুঁড়ো পাউডার ছড়াচ্ছে আততায়ীর হাতের ছাপ পাবার আশায়। রোগা বয়স্ক একজন ছোট টেবিলে বসে আছে। তার পায়ের কাছে কালো বাক্স।

ঢুকতেই সবকটি মুখ আমার দিকে ঘুরে গল। চোখ পড়ল ডিভানে শায়িত মৃত জ্যাকের দিকে। বিধ্বস্ত শরীর। বিছানার এত কাছে, যেন মৃত্যুর সময় সে পালাতে চেয়েছিল, একজোড়া সাঁতারের পোষাক ছাড়া শরীরে আর কিছু নেই। ঘাড়ে এবং পিঠের ডান দিকে কালচে লাল গর্ত। গর্তের চারদিকে মারাত্মক কালশিরা দাগ, তার সূর্যআতপ্ত মৃত মুখে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক।

হিমশীতল ধূসর চোখ মেলে র‍্যানকিন প্রশ্ন করেন

–ইনিই তো?

–হ্যাঁ।

রোগা বয়স্ক লোকটার দিকে তাকান র‍্যানকিন।

–কাজ শেষ ডাক্তার?

–শেষ, তবে, পেশাদারি খুনির ছোঁয়া আছে এতে।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর দুর্দান্ত সাহস দুটোই কাজে লেগেছে। এ ক্ষেত্রে মনে হয়, খুনী বরফ খোঁচা ছুরি ব্যবহার করেছে। খুব কাছ থেকে বা ঘনিষ্ঠ অবস্থায় আচঙ্কা ছুরি মারা হয়েছে। ফলে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। আমি বলতে পারি ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ইনি খুন হয়েছেন।

র‍্যানকিন নির্দেশ দেনজলদি ডেডবডি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন।

আর, আমার দিকে ফিরে বলেন, চলুন, ফেরা যাক।

আমরা কেবিন ছেড়ে বালিয়াড়িতে পা রাখি। র‍্যানকিনের কাছে আসেন ক্যান্ডি। র‍্যানকিন জানান–আমি ব্রান্ডনের হোটেলে যাচ্ছি। দেখুন, এখানে কি পাওয়া যায়। ডাক্তার বলেছেন বরফ খোঁচা ছুরি ব্যবহৃত হয়েছে। জাগসনকে আরো লোক দিন। ওরা ছুরি খুঁজে দেখুক। খুনী ওটা কাছাকাছি কোথাও ফেলে যেতেও পারে। যদিও তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।

অতঃপর তিনি সোনার স্ট্র্যাপ কামড়ানো শীর্ণ মনিবন্ধে ঘড়ি দেখে বলেন–আড়াইটে নাগাদ আমার অফিসে দেখা করবেন মিস্টার ব্রান্ডন।

তপ্ত বালিয়াড়ি ভেঙে তিনি হেঁটে যান। জনতা রাস্তা ছেড়ে দেয়। তাকে অনুসরণ করে পার্কিং জোনে এসে বলি–ঐ বুইকটা সিপ্পির ও আমার। ওটা কি আপনাদের কোন কাজে লাগবে। র‍্যানকিন ফিরে এসে ব্যুইকের দিকে তাকান। এক অধঃস্তন কর্মচারীকে ডেকে বলেন–সার্জেন্ট ক্যান্ডিকে বলল যে বুইকটা করে সিপ্পি এসেছিলেন। তার গায়ের হাতের ছাপ নেওয়া হলে যেন এটি ব্রান্ডনের হোটেলে রেখে আসা হয়।

–ঠিক আছে? র‍্যানকিন আমার দিকে তাকান।

–ধন্যবাদ। আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

আমরা পুলিসের গাড়িতে গিয়ে উঠি। গাড়ি ছোটে হোটেলের দিকে।

কোনের দিকে বসেছেন র‍্যানকিন। সিগার বের করে। ধাতব সিগার টিনে কয়েকবার ঠুকে ছোট ছোট দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরেন। আগুন জ্বালিয়ে একমুখ ধোয়া টেনে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকেন।

আসুন, সিগার নিন। এবার বলুন, আপনি কে? সিপ্পিই বা কে? কি করে এসব ঘটলো? আস্তে আস্তে বলুন। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা খুলে বলবেন।

সিগার ধরিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবলাম। তারপর শুরু করলাম। বললাম, সিপ্পি ও আমি সফলতার সঙ্গে গোয়েন্দা তথা এনকোয়ারীর ব্যবসা চালাচ্ছি। নিউ ইয়র্কে আমি তিন সপ্তাহ ছিলাম তখন জ্যাকই অফিস দেখতেন। নিউইয়র্কে থাকাকালীন সিপ্পি আমাকে জরুরী টেলিগ্রামে সেন্ট রাফাইল সিটিতে আসতে লেখেন। সেখানে একটা বড় অর্থাৎ

প্রচুর টাকার কাজ হাতে এসেছে। সুতরাং কোন রকমে কাজ সেরে প্লেনে করে উড়ে আসি লস্ এ্যাঞ্জলসে, তারপর ওখান থেকে ট্রেনে এখানে সকাল সাড়ে এগারোটায় পৌঁছেছি। নির্ধারিত হোটেলে গিয়ে দেখলাম, সিপ্পি যথারীতি আমার জন্য ঘর বুক করে রেখেছেন। শুনলাম তিনি বেরিয়ে গেছেন। শাওয়ার খুলে যখন স্নান করছিলাম। তখন সার্জেন্ট ক্যান্ডি দরজা আঘাত করেন। তারপর তার সঙ্গে এখানে ব্যস্, এটুকু আমি বলতে পারি।

–সিপ্পি বলেননি কাজটা কি? দু–দিকে মাথা নেড়ে বলি–জ্যাক চিঠি ফিটি খুব একটা লেখেন না। মনে হয় তিনি লেখার চেয়ে সব মুখে জানাবেন বলেই ঠিক করেছিলেন।

খানিক চুপ থেকে ব্র্যানকিন প্রশ্ন করেন–সঙ্গে আপনার লাইসেন্স আছে?

পকেট বইটা বের করে দিলাম। অভিজ্ঞ চোখে খতিয়ে দেখে সেটা ফেরৎ দিতে দিতে বললেন–আচ্ছা আপনার কি কোন ধারণা আছে কে তাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন বা কোন্ কেসের জন্য তিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

–আদৌ না।

কঠিন চোখে তাকান র‍্যানকিন–জানলে, আমায় বলতে পারেন।

–সে প্রশ্নই ওঠে না। জানলে বলতাম।

আপনার কি মনে হয় এই কেসের জন্য উনি কি কোন নোট রেখে গেছেন? বা প্রগ্রেস রিপোর্ট?

মনে হয় না। সাধারণতঃ উনি কাগজপত্রে কিছু লিখতেন না। ও কাজটা দুজনে একসঙ্গে বসে করতাম। আর রিপোর্ট আমিই তৈরী করতাম।

–সানফ্রানসিসকোয় অফিস থাকতে নিউ ইয়র্কে গেছিলেন কেন?

ক্লায়েন্টের ডাকে। যার সঙ্গে এর আগে আমরা কারবার করিনি। আমাদের মক্কেল তখন নিউ ইয়র্কে ছিলেন আর তার কাজের ভার শুধু আমাকে দিতে চেয়েছিলেন।

–সিপ্পি তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন? পুরনো মক্কেলের কাজ তাকে করতে হচ্ছিল–সেজন্য কি?

হতে পারে।

–সদ্য যে কাজ উনি হাতে নিয়েছিলেন, তাতে তেমন কোন আলোকপাত উনি করেছিলেন বলে কি আপনার মনে হয়, যার ফলে তাকে খুন হতে হয়?

একটু ইতস্ততঃ করি। মনে পড়ে রিসেপশন ক্লার্ক বলেছিলেন–এক যুবতীর সঙ্গে জ্যাক বেরিয়ে গেছেন। বললাম জানি না। হোটেলের রিসেপশনে আমাকে বলেছিলেন যে এক রমণী এসে ওনাকে ডেকে নিয়ে যায়। মেয়েদের পেছনে ধাওয়া করা ওঁর মস্ত দোষ। পছন্দ মতো এক বিবাহিত মহিলার পাল্লায় পড়ে কি দুর্ভোগ। মহিলার স্বামী এসে

অভিযোগ করেন, প্রতিবাদ জানান। আমার মনে হয়, এ ধরনের নারী সংসর্গ তার অনেক ঘটেছে।

–উনি কি বিবাহিতা রমণীদের সঙ্গেও...

–ও নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, সুন্দরী হলেই হল। ভাববেন না ওনাকে নিয়ে কুৎসা গাইছি। উনি আমার প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তবে কাজের ক্ষেত্রে ওঁর এই দুর্বলতা বড় ক্ষতি করতো। আমিও বিরক্ত হতাম।

কিন্তু স্ত্রীর প্রেমিককে বরফ খোঁচা ছুরি দিয়ে খুন করে স্বামী অন্তর্হিত, বড় একটা ঘটে না। কাজটা পেশাদারী হাতের।

হতে পারে সেই স্বামী পেশাদারী খুনীকে ঐ ছুরি ব্যবহার করেছিল তেমন কোন রিপোর্ট আছে আপনাদের রেকর্ডে? মাথা নাড়েন র‍্যানকিন।

না, এ হল ধনীদের শহর। অজস্র ছেলে ছোকরা ঘুরে বেড়ায়–যাদের অনেকে ভয়ঙ্কর ছুরি নিয়ে কাউকে পালাতে দেখা যায়নি, এখন সিপ্পি কি কাজ নিয়ে এখানে এসেছিলেন সে সম্বন্ধে যদি একটু আলোকপাত করেন। আমার ধারণা, ও–ই কাজের মধ্যেই রয়েছে হত্যারহস্য।

জ্যাকের মক্কেলের নাম যতক্ষণ না নিজে ভালোভাবে জানতে পারছি ততক্ষণ র‍্যানকিনকে কিছু না বলাই ভাল। তবে নামটা জানতে, ফিরতে হবে অতীতে। এলা বরং জানতে

পারে। এলা হল, আমাদের টাইপিস্ট। সানফ্রান্সিসকোর অফিসে বসে থাকলে ওর কাছেই পাওয়া যবে জ্যাকের মক্কেলের নাম ঠিকানা।

–থামো ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয় র‍্যানকিন। পাঁচ মিনিটে পৌঁছে গেছি হোটেল অ্যাদেলফি।

লবি পেরিয়ে রিসপশনে পৌঁছে দেখি, হোৎকা ক্লার্কটির চোখে চাপা উত্তেজনা। স্ত্রী পরিবৃত দুই প্রৌঢ় ভদ্রলোক যেন ভিক্টোরিয়ান উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসা চরিত্র। অদ্ভুত প্রাচীন পোষাক। কান খাড়া। নট নড়ন চড়ন। শুধু চেয়ে আছেন ফ্যাল ফ্যাল করে। র‍্যানকিন টিপ্পনি কেটে বলেন–চলুন, অন্য কোথাও গিয়ে কথা বলি, যেখানে এই বুড়ো ভামগুলো শুনতে পাবে না। শেষ কথাগুলো বেশ জোরেই বলেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই লেফটেন্যান্ট, বিগলিত ক্লার্কটি আমাদের নিয়ে গিয়ে তার ডেস্কের পিছনে ছোট্ট অফিসে বসায়। বলেন–ইয়ে, কোন গোলমাল হয়েছে নাকি?

–এখানে নয়। র‍্যানকিন শুধোন–আপনার নাম? মুখ শুকিয়ে যায় ক্লার্কটির। কোনরকম উত্তর দেন, এডউইন ব্রিওয়ার।

সিপ্পি ঠিক কখন, এখান থেকে গেছেন?

–সাড়ে দশটা হবে।

সঙ্গে কোনো মহিলা ছিলেন?

–হ্যাঁ। এক মহিলা তার খোঁজ করেছিলেন? সেই মহিলা আমার সাথে কথা বলার সময় এলিভেটর থেকে সিপ্পি নামেন। তারপর দুজনে চলে যান।

মহিলা নাম বলেছিলেন?

অসহায় ভাবে ঠোঁট নাড়েন ব্রিওয়ার। বলেন–ও হ্যাঁ, নাম বলেননি তবে মহিলাকে সিপ্পির ঘনিষ্ঠ বা পূর্ব পরিচিত বলে মনে হয়েছিল।

–কোন দিক দিয়ে?

মহিলাকে দেখে দ্রুত এগিয়ে এসে সিপ্পি বললেন হ্যালো বেবি ডলতারপর তার কোমরে হাত রেখে দুজনে গল্প করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

তখন মহিলার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

–হাসছিলেন, তবে বুঝতে পারছিলাম, পছন্দ করছেন না। মহিলা ঠিক ঐ টাইপের নয়।

–তাহলে কেমন?

–মহিলার বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে। যা ব্যাখ্যা করা কঠিন। খেলো বা সস্তা ধরনের মনে হয়না।

মাঝখানে আমি বলি–জ্যাক কারো পছন্দ–অপছন্দের ধার ধারতেন না। সম্মানেরও না। মুড ভালো থাকলে তিনি বিশপের স্ত্রীকেও টিটকারী দিতে পারেন।

ভদ্র কোচকান র‍্যানকিন। প্রশ্ন করেন ব্রিওয়ার, আপনি ঐ মেয়ের বর্ণনা দিতে পারেন?

দু-হাত কচলান ব্রিওয়ার। কিরকম অসহায় দেখায় তাকে। সেঁক গিলে বলেন-ভারী, আকর্ষণীয়। কালো, চমৎকার চেহারা। পরনে ছিল নেভী স্ল্যাকস আর সাদা সার্ট। চোখে মস্ত রোদ চশমা। মাথায় বড় টুপি। মুখ অতটা দেখতে পাইনি।

বয়স?

কুড়ির মধ্যে পঁচিশও হতে পারে।

আবার দেখলে চিনতে পারবেন?

-হ্যাঁ, অবশ্যই পারব। ব্রিওয়ারের ডেস্কের অ্যাসট্রেতের‍্যানকিন নিঃশেষসিগারেট গুঁজে দেন। বলেনধরুন, সেই মহিলা যদি মস্ত রোদ চশমা আর টুপিনা পরে কেবলমাত্র সাদা পোষাক পরেন, তাহলেও কি তাকে চিনতে পারবেন? একমুহূর্ত ভেবে ব্রিওয়ার বলেন-সম্ভবতঃ না।

-তাহলে আপনি তার পোষাকগুলো চেনেন, তাকে নয়?

হু

-সেটা যথেষ্ট সহায়ক নয়। আচ্ছা, সিপ্পি হ্যালো বলার পর কি হল?

–সিপ্পি বলেছিলেন, দু–ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ফিরে আসবেন, তা এখনই বেরিয়ে পড়া ভালো। — এরপর ওনারা। সিপ্পির গাড়ি করে চলে যান।

তবে কি মহিলা তার গাড়ি এখানেই রেখে যান?

কই, তেমন তো দেখিনি, মনে হয়, তিনি হেঁটে এসেছিলেন।

–সিপ্পির ঘরের চাবি দিন।

–গ্রীভসকে ডাকতে পারি কি? উনি আমাদের হাউজ ডিটেকটিভ?

দু–দিকে মাথা নাড়েন র‍্যানকিন– না। আমি চাই না, আপনাদের হাউজ ডিটেকটিভ খ্যাপার মত সব লণ্ডভণ্ড করে খুঁজতে গিয়ে কোন ক্লু নষ্ট করে দিক। অফিস থেকে বেরিয়ে ব্রিওয়ার কী বোর্ড থেকে চাবি এনে দেন। আমরা তাকে অনুসরণ করি। চার বুড়ো আমাদের দিকে অপলকে চেয়ে থাকে। ব্রিওয়ার জানান সম্ভবতঃ সিপ্পির কাছেই তার ঘরের চাবি থেকে গেছে। আপনাদের ডুপ্লিকেট দিলাম, আচ্ছা মিস্টার সিপ্পির কি কিছু হয়েছে?

চার বৃদ্ধ খানিকটা এগিয়ে আসে, কি হয়েছে–জানাতে চায় তীব্র আগ্রহে।

র‍্যানকিন চেঁচিয়ে বলেন–ভদ্রলোকের পেটে বাচ্ছা হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম। অবশ্য আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই।

আমরা এলিভেটরের দিকে চললাম। বৃদ্ধাদের চোখে অপার বিস্ময়। তখনো চেয়ে আছে আমাদের গমন পথের দিকে।

তিনতলায় যাবো, এলিভেটরের বোতামে চাপ দিয়ে তিনি বলেন–হোটেলের এসব বুড়োদের আমি ঘেন্না করি। আমি বলি আপনিও একদিন বুড়ো হবেন। হোটেলে ওরামজা মারতে আসেননা।

–সেন্টিমেন্টালে খোঁচা দিলেন তো?

মুখ নামান র‍্যানকিন মেঝের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলেন–আমি ভাবতাম সবকিছু আমার দেখা হয়ে গেছে।

এলিভেটরে দ্বিতীয় তলা পার হয়ে যেতে যেতে প্রশ্ন করি–কেবিনের দারোয়ানের কাছে মেয়েটার সম্পর্কে কিছু জেনেছেন?

–উহু সেই একই বিবরণ। কেবিনে দুটি ঘর ছিল। মাঝে দরজা, একটা ঘর মহিলা, অপরটি সিপ্পি ব্যবহার করেছিলেন। একটি ঘরে মহিলার স্ন্যাকস, সার্ট, টুপি, সানগ্লাস পাওয়া গেছে, অন্য ঘরে সিপ্পির পোষাক পাওয়া গেছে।

–কেবিনে মহিলা তার পোষাক ফেলে গেছেন?

— তাই তো বলছি। এর দুটি অর্থ হয়। এক, মহিলা এ ঘটনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলার জন্য ঠিক করেছিলেন সাঁতারের পোষাক পরে পালাবেন, এ শহরে

প্রত্যেকেই সাঁতার স্যুট পরে ঘুরে বেড়ান, যেন সাঁতার কাটতে যাচ্ছেন... আর দুই খুনী, সিপ্পিকে খুন করার পর মহিলাকে তুলে নিয়ে গেছে। আমার লোকেরা সমুদ্রতীর খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই খুনের সঙ্গে মহিলার কোনো সম্পর্ক নেই বলেই আমার ধারণা।

তৃতীয় তলে থামে এলিভেটর। জিজ্ঞাসা করি ঐ কেবিন থেকে মহিলাকে কেউ বেরুতে দেখেছে? না, তবে এখনো সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। করিডোর দিয়ে হেঁটে যাই দুশো সাতচল্লিশ নম্বর ঘরের দিকে।

চাবি খুলতে খুলতে র‍্যানকিন বলেন–কি সুন্দর ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন মহিলা। এ শহরে লোকে মুখ দেখে না, দেখে ফিগার।

চাবি খুলে ঘরে ঢুকি। আমার চেয়েও বড় ঘর। বায়ুহীন, গুমোট গরম।

ঘরে যেন সাইক্লোন বয়ে গেছে। আলমারির ড্রয়ার খোলা, আসবাবপত্র ছড়ানো। জ্যাকের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। বিছানা ওল্টানো। ছুরি দিয়ে ফালা করা তোষক, বালিশ ফাটা। মেঝেতে স্তূপীকৃত তুলল। ভাঙা ব্রিফকেসের কাগজপত্র ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে।

র‍্যানকিন বলেন, খুব তাড়াতাড়ি কাজ সেরেছে।

যাওবা কিছু পেতাম তারও আশা নেই। লোক পাঠাচ্ছি, দেখি, যদি হাতের ছাপ মেলে। তবে বাজি রেখে বলছি। তাও পাওয়া যাবে না। তারপর দরজার তালা বন্ধ করে দেন।

.

০২.

বিছানায় শুয়ে আছি। কানে আসে দুমদাম শব্দ। পাশের ঘরে পুলিশের লোক ক্লু খুঁজছে। হতাশা আর একাকীত্বে ডুবে যাই।

জ্যাক নিজের ভুল বুঝতে পারেনি, যদিও কাজের ব্যাপারে সে নিখাদ ছিল।

পাঁচ বছর আগে আমাদের প্রথম দেখা। আমি তখন ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসের স্পেশাল ইনভেস্টিগেটর। জ্যাক ছিল সানফ্রান্সিসকো ট্রিবিউন পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টার। ক্রমে গাঢ় বন্ধুত্ব হয়। একরাতে স্কচের বোতল শেষ করতে করতে দুই বন্ধু ঠিক করলাম ওপরতলার খবরদারি আর সহ্যকরবনা। ফানুসের মতো আমাদের পিছনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে বসে বসে ওরা মজা মারবে। আর আমরা? ছুটবো, শুধু ছুটে যাবো...। না। আজ থেকে আর অর্ডার নেবো না। অল্প নেশাগ্রস্ত হলেও চাকরি ছাড়ার ঝুঁকি, মাস মাইনের অনিশ্চয়তা ও এই শহরে নতুন অফিস খুলে বসার ঝক্কি ঝামেলা নিয়ে বিব্রত ছিলাম। হাতে তেমন মূলধনও ছিল না। জ্যাকের চেয়ে আমি পাঁচশো বেশি দিলাম। বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। ভাবলাম, এই অভিজ্ঞতা পাথেয় করে শুরু করা যাক।

অজস্র অনুসন্ধানী এজেন্সি ছিল শহরে। আমরা তাদের অধিকাংশই জানতাম। তারা আমাদের ভয়ের কারণ নয়। কাজ আমরা ঠিকই পাবো।

আধবোতল স্কচ শেষ করে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

প্রথম থেকেই আমরা ভাগ্যবান। একবছর পর আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর আর পেছনে তাকাইনি।

জ্যাকের মৃত্যু আমায় ভাবাচ্ছে। যে কাজ হাতে নিয়েছিল তা থেকে ওকে সরানোর উদ্দেশ্যে খুন করা হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং খুব সম্ভব ও কোন কুচক্রী মেয়ের পাল্লায় পড়েছিল। এবং ঐ চক্রই ওকে নিকেশ করে দেয়। র‍্যানকিনের ভাষায় ইঁদুরের লেজের মতো এতটুকু একটা বরফ খোঁচা ছুরি পেশাদারী দক্ষতায় ব্যবহৃত হয়েছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকাই। বারোটা পঁয়তাল্লিশ। ক্ষুধার্ত লাগছে। গতরাত থেকে পেটে শক্ত কিছু পড়েনি। পাশের ঘরে ওরা কাজে ব্যস্ত। এখন খেলে সময় বাঁচবে।

গলায় জামার বোম আঁটছি। এমন সময়ে দরজা খুলে র‍্যানকিন মুখ বাড়ান। দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁতের ফাঁকে সিগারেট নাড়াচাড়া করতে থাকেন।

আমি জানাই–খেতে যাচ্ছি। আমাকে দরকার।

পাশের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন–ও ঘরে কিস্যু নেই। হাজারটা হাতের ছাপ। কাকে সনাক্ত করবে। তদন্তের কোন উন্নতি আশা করবেন না। কোন সূত্র থেকে বুঝতে পারলাম না সিপ্পি কার হয়ে কাজ করছিলেন।

–আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, যে ওঘর লণ্ডভণ্ড করেছে সেও কিছু পায়নি। জ্যাক তদন্তের রিপোর্ট রাখতেন না।

–আপনি এখনো জানেন না মক্কেল কে? র‍্যানকিনের চোখে অনুসন্ধিৎসা–মক্কেলের নাম গোপন করেছিলেন বলেই যে উনি খুন হন তার কোন মানে নেই ব্রান্ডন। ভালো চান তো তার নাম বলুন। না বললে বুঝবো আমাকে ভেড়ুয়া বানাচ্ছেন।

–ভেড়ুয়া বানাচ্ছি না আপনাকে লেফটেন্যান্ট।

–আচ্ছা, আপনার কোন সহকারী সেখানে আছেন?

–আমাদের একজন টাইপিস্ট আছে। সদ্য সতেরোয় পড়েছে। বোবার মত ঘাড় গুঁজে কাজ করে মাইনে নেয়। তাকে আমরা কিছু বলি না।

র‍্যানকিনের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। বেশ মক্কেলকে খুঁজে পেলে আমার সাথে দেখা করবেন। আর, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে না পেলে আমি আবার আসবো। তখন দেখে নেবো আপনাকে। দরজা ভেজিয়ে চলে যান র‍্যানকিন।

চুলোয় যাক খাওয়া। র‍্যানকিন সানফ্রান্সিসকোর পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। তার আগে এলার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আমার কথা বলা দরকার।

এলিভেটরে নিচে নাবি। হোটেলের অদূরে ওষুধের দোকান। সেখানকার ফোন বুথে নিজেকে যথাসম্ভব আড়াল রেখে অফিসে নম্বর ডায়াল করলাম।

র‍্যানকিনকে এলা সম্বন্ধে অর্ধসত্য বলেছি। সদ্য সতেরোয় পা দেওয়া মেয়েটা হাবাগোবা নয়। ক্ষুরধার বুদ্ধি। ভীষণ চালাক। স্বস্তি পেলাম তার গলা শুনে–গুড আফটারনুন, স্টার এজেন্সি থেকে বলছি।

-লিউ বলছি। আমি দ্রুত বলে যাই–সেন্ট রাফাইল সিটি থেকে বলছি। একটা কাজ নিয়ে জ্যাক এখানে আসে এবং টেলিগ্রাম করে আমায় ডাকে। খবর খারাপ এলা। ও মারা গেছে। কেউ ছুরি মেরেছে।

কানে আসে নারীকণ্ঠের স্পষ্ট ফোঁপানি। আহা, মেয়েটি জ্যাককে পছন্দ করতো। প্রায় প্রেমে পড়ে গেছিল।

জ্যাক মারা গেছে। তার স্বরে কাঁপন।

–হ্যাঁ। এখন শোন এলা, এটা খুব জরুরী। পুলিশ জানতে চাইবে, কাজটা কি ছিল, আর মক্কেল কে। জ্যাক আমায় কিছু বলেনি। তোমায় কি বলেছে?

–না। উনি শুধু বলেছিলেন একটা কাজ এসেছে। তারপরই তো সেন্ট রাফাইল সিটিতে চলে যান। তবে, উনি আপনাকে টেলিফোনে বা টেলিগ্রামে ডেকে নেবেন বলেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করো নি, কাজটা কি।

টের পাচ্ছি, মেয়েটা কাঁদছে। এলার জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু এখন ভাবাবেগের সময় নয়। প্রশ্ন, করি, কি করে কাজটা পেল? কোনো চিঠি বা টেলিফোন?

–এক ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন।

–তিনি নাম বলেছিলেন?

না। আমি জিজ্ঞাসা করলেও জানান নি। শুধু আপনাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন।

জ্যাক কিছুই জানায় নি। অর্থাৎ, এ কেস মীমাংসার আর কোন রাস্তা নেই।

হঠাৎ মাথায় এক ভাবনা ঝিলিক খেলে গেল। মনে পড়লো, টেলিফোনে কারুর সঙ্গে কথা বলার সময় জ্যাকের অভ্যাস ছিল সামনের কাগজে আঁক কষার। হাতে পেন্সিল আর কানে রিসিভার থাকলে ওর কাজ হল সংলাপের সংক্ষিপ্তসার লিখে রাখা। কখনো আবার ছবিও আঁকতো। অফিসের ছবি।

–এলা, জ্যাকের টেবিলের ওপর যে ব্লটিং পেপার আছে দেখো তো, জ্যাক তার উপর কোন মক্কেলের নাম লিখে রেখে গেছেন কিনা। ওর হিজিবিজি কাটার অভ্যাস তো জানোই।

আমি অপেক্ষা করে থাকি। শিরদাঁড়া বেয়ে ঘাম গড়ায়। বুথের ভিতর অসম্ভব গরম। একটু দরজা খুলে হাওয়া আসতে দিলাম। তখনই চোখে পড়লো লোকটার পা। সোড়া বার–এর পেছনে। ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে চেহারা বলে দিচ্ছে লোকটা পুলিস, চোখাচোখি হতে, এক কাপ কফি নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়ালো। চোখ এদিকে।

নির্ঘাৎ র‍্যানকিনের চ্যালা। হয় তো ভাবছে আমি অফিসে ফোন করছি। ভাবুক গে। টেলিফোনের ও প্রান্তে এলার গলায় সম্বিত ফিরে পেলাম

ব্লটারে অনেক হিজিবিজি। তার মধ্যে একটা নামই পড়া যায়, বড় হরফে লেখা লী ক্রিডি।

–ওকে এলা। এখুনি ব্লটারটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে টয়লেট ফেলে দাও। যে কোন মুহূর্তে পুলিস ফোন করবে তোমায়, ওরা যেন কাগজটা না পায়।

পাক্কা তিন মিনিট অপেক্ষা করার পর ফোনে এলা জানালো কাগজটা নষ্ট করে দিয়েছে।

–লক্ষ্মী মেয়ে। এখন শোনো আমি পুলিশকে বলেছি। তুমি একটি নির্বোধ মেয়ে। হাবাগোবা। তোমাকে আমরা কিছুই জানাই না। সেভাবে অভিনয় কোরো। আর হ্যাঁ, ওদের বোলো, একটা ফোন পেয়ে জ্যাক তোমায় বলে গেছে, সে সেন্ট রাফাইল সিটিতে যাচ্ছে, তুমি যেন এসব কিছুই জানো না। ভয় পেয়ো না।

যা বললাম, মনে রেখো, আরেকটা কথা। আমি যেতে পারলে কাজটা তোমায় দিতাম না। যেতে যখন পারছি না তখন তুমিই জ্যাকের স্ত্রীকে জ্যাকের মৃত্যু সংবাদটি দিও, বোলো, আমি চিঠি দিচ্ছি।

আচমকা গলা নাবিয়ে এলা ফিসফিসিয়ে বলে, দুজন লোক এই মাত্র ঢুকলো। মনে হচ্ছে গোয়েন্দা...বলেই লাইন কেটে দিল।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছি, বুথ ছেড়ে সামনের কাউন্টার পেরিয়ে ঐ র‍্যানকিনের চ্যালার কাছাকাছি এসে দাঁড়াই। লোকটা কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে চকিতে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। আমি স্যান্ডউইচ আর কফির অর্ডার দিলাম।

খাওয়া সেরে সিগারেট ধরলাম। দেখলাম, অত্যন্ত ক্ষুব্ধ লোকটা ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে কালো গাড়িতে উঠে এক নিমেষে উধাও হল।

বেলা দেড়টা।

হোটেলে ফিরে সোজা নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছি, দেখি, জ্যাকের ঘরের দরজা খোলা, জানলার কাছে পালোয়ান গোছের একটা লোক ব্যাগি স্যুট পরে দাঁড়িয়ে। তার হাত দুটো মস্ত পাছায়। চোখ দুটি ঘুরছে ঘরময়, লোকটা ঘুরেই দেখলো আমাকে। চোখে রাগ ও সন্দেহ দেখে মনে হয় প্রাক্তন পুলিস।

–কিছু চুরি গেছে?

–আপনার এখানে কি দরকার? গম্ভীর গলায় ঝাঁঝ।

–আমি ব্রান্ডন। পাশেই আমার ঘর। আপনি গ্রীভস? স্বস্তিতে ঘাড় হেলায় লোকটা।

ঘরটা দেখছি গোছানো। সাফ সুতরো করা হয়েছে।

ঘরের কোণে জ্যাকের বিবর্ণ স্যুটকেস। রেইন কোট, টুপি আর একটা টেনিস র‍্যাকেটের কাঠামো জড়ো করা, আবর্জনার মতো।

–এগুলি দুষ্কৃতীরা নষ্ট করে দিয়েছে? প্রশ্ন করি। ওপর নীচে মাথা নাড়ায় গ্রীভস।

–এগুলো আমি ওনার স্ত্রীর কাছে ফেরৎ দিতে চাই। আমার জন্য কি কেউ একাজটা করবে?

–জো করবে। ওকে দরকার পড়লে বেল বাজাবেন।

যদি আপনার বেশি কাজ না থাকে তো আমার ঘরে আসতে পারেন। একটা ডাবল সিক্সটি নাইনের বোতল আছে। খেতে খেতে কাজের কথা হবে।

–হাতে কিন্তু সময় আছে। চলুন। তাকে নিয়ে ঘরে এলাম।

একটা উঁচু চেয়ারে গ্রীভস, আমি বিছানায় বসলাম। বরফ গলছে অনেকক্ষণ। তিন আঙুল হুইস্কি মিশিয়ে গ্রীভূসকে দিলাম। তাকে কেন জানিনা সহ্য করতে পারছি।

পানীয়তে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বলেন–কে খুন করেছে, ওরা জানে?

–ওরা জানলেও আমায় বলবে না। আমি বলি, জ্যাক যে মেয়েটার সাথে গেছিল। তাকে চেনেন?

মাথা নাড়ে গ্রীভস–মেয়েটাকে দেখেছি। র‍্যানকিন আমার সাথে কথা বললে জানতে পারতেন। কিন্তু উনি শুধু ব্রিওয়ারের সঙ্গে কথা বলতেই ব্যস্ত।

জিজ্ঞাসা করি–কিন্তু আপনি জানাননি কেন তাকে?

–উনি ব্রিওয়ারের কাছে মেয়েটার বর্ণনা চাইলেন। গ্রীভস বলে যান–তাহলেই বুঝুন। কি ধরনের পুলিশ উনি। ব্রিওয়ার কেবল পোষাক দেখেছে। আমি লক্ষ্য করেছি মেয়েটাকে। এমনভাবে আপাদমস্তক ঢেকেছিল যাতে পরে না চেনা যায়। সেদিন চুল ডাই করেছিল বা উইগ পরেছিল। যাই করুক, আমি জানি তার চুল সোনালী রঙের।

–কি করে নিশ্চিত হচ্ছেন এত?

ভারিক্কি চালে হাসেন গ্রীভস–আমার চোখ বলছে। দেখেছি তার বাহুর ওপর চুলের প্রান্ত ভাগের রং। মেয়েটার গাত্রবর্ণ ফর্সা।

তথাপি তাকে নিরুৎসাহ না করে চুপ করে থাকি।

উঠে দাঁড়ান তিনি। লবিতে এসে থেমে বলেন–মেয়েটা ডান হাত, ডান হাতে নিজের উরুর ওপর পিয়ানোর রিড টেপার ভঙ্গিতে আঙুল চালান–সর্বদা এমন করতো। মানে, মেয়েটার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। হয়তো নিজেও সে জানে না এই অভ্যাসের কথা। সঠিক বলা শক্ত, তবু আমার মনে হয়েছে যে সে কোন শো ব্যবসায়ে যুক্ত।

–র‍্যানকিনকে বলেছেন এসব?

সিগারেট নিভিয়ে দু–দিকে মাথা নাড়েন গ্রীভস।

জ্যাকের ঘরে দুষ্কৃতি ঢুকলে কি করে?

–সিপ্পির চাবি নিয়ে। তিনি চাবি নিয়েই বেরিয়ে ছিলেন। তাকে খুন করার পর খুনী চাবি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি এখানে এসে সন্তর্পণে ওপরে উঠে ঘরে ঢোকে। একাজে স্নায়ুর জোর থাকা চাই। আর খুনীর তা ছিল বলে অক্লেশে কাজ সেরে চলে গেছে নিরাপদে। ওই সকালে আমি বা কর্মচারীরা কেউ ওখানে ছিল না।

ঠিক এসময়ে আমার মনে হল গ্রীভসকে জানানো দরকার কমবেশী আমিও এ ব্যাপারে যুক্ত। আমার কার্ড এগিয়ে দিলাম, কার্ড পড়ে রীতিমত চমকে উঠলেন। অপ্রস্তুত নাক ঘষে কার্ড ফেরৎ দিয়ে বললেন–উনি কি আপনার পার্টনার ছিলেন?

–হ্যাঁ।

সর্বদা আমি আপনাদের দলে ভিড়তে চেয়েছি। আপনাদের লাইনে আমাদের চেয়ে পয়সা বেশি। তো চলছে কেমন?

–এ দুর্ঘটনার আগে বেশ চলছিল। এখন কাজ বন্ধ রেখেছি যতক্ষণ না খুনীকে ধরতে পারছি।

একটু থেমে আবার বললেন–লস অ্যাঞ্জেলস থেকে একবার এক গোয়েন্দা এলেন আত্মহত্যার একটা কেসের তদন্ত করতে। মৃতের বিধবার ধারণা ছিল ওটা আত্মহত্যা নয়, খুন। সেজন্য তিনি গোয়েন্দাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ক্যাচেন তাকে বারণ করেন। তবু গোয়েন্দা তদন্ত চালাতে থাকলেন। একদিন তিনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ এক মাতাল গাড়ি তাকে ধাক্কা দিল। গাড়ি দুমড়ে–মুচড়ে গেল। কলার বোন ভেঙে গোয়েন্দা

প্রবর পড়ে থাকলেন হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে যখন ছাড়া পেলেন, ছমাসের জন্য তার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল হল মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য। অথচ হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগে পুলিসগুলো আধ পাঁইট হুইস্কি তার গায়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল, এ কথা কেউ মানল না।

বাঃ চমৎকার! খবরের জন্য ধন্যবাদ। ক্যাচেন সম্বন্ধে সজাগ থাকবো।

–মদের জন্য ধন্যবাদ। প্রয়োজন হলে ডাকবেন, সাধ্যমত সাহায্য করব।

পানীয় শেষ করে গ্লাস নামান গ্রীভস।

আমি বলি–মনে থাকবে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ প্রশ্ন করি–আচ্ছা, লী ক্রিডি নামে কাউকে চেনেন?

তাকিয়ে থাকলেন অপলক। তারপর দরজা ভেজিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন–এ শহরের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি।

আমি উত্তেজনা চেপে বলি কত বড় ধনী?

প্রথমে একশো মিলিয়ন বা ছিল তার সম্পত্তি। গ্রীন স্টার সিপিং লাইন কিনেছেন। সানফ্রানসিসকো থেকে পানামা যাতায়াত করে তার ট্যাঙ্কারগুলো।

কিনেছেন এয়ার লিফট করপোরেশন। এখান থেকে মিয়ামী উড়ে যায় তার বায়ুদূত। আরো দীর্ঘ তার সম্পত্তির তালিকা। তার মধ্যে তিনটে খবরের কাগজ, দশ হাজার কর্মী সম্মিলিত এক ফ্যাক্টরি। গাড়িতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ লাগাবার কাজে মহিলারা যুক্ত। তিনি ক্যাসিনো কিনেছেন। তার হাতে গড়ে উঠেছে লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়ন, রিঞ্জা প্লাজা হোটেল এক দুর্দান্ত বড়লোকদের মাসকেটিয়ার্স ক্লাব। পাঁচ হাজারের ওপর রোজকার চলে। রক্তপরীক্ষা করার পর হয়তো আপনি ঐ ক্লাবে ঢোকার অনুমতি পাবেন। বুঝতেই পারছেন উনি কত বড় ধনী।

–উনি কি বিবাহিত?

–ও সিওর। ফিল্ম স্টার ব্রিজিৎ বর্দকে মনে আছে? তিনি ওর স্ত্রী।

মনে পড়লো বছর চারেক আগে কোন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ঝড় তুলেছিলেন ব্রিজিৎ। কয়েকটি ছবিতে তাকে দেখেছিলাম। বন্য আর কোমলের সংমিশ্রণের জন্য তার খ্যাতি।

–তা হঠাৎ ক্রিডির সঙ্গে কি ব্যাপার?

–কিছু না, নাম শুনেছি। একজন তার সম্বন্ধে বলছিল। তাই কৌতূহল। লোকটা কে?

–গ্রীভস চিন্তান্বিত হয়ে কয়েক পলক চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। সিগারেট ধরিয়ে আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। জ্যাক বলেছিল একাজে প্রচুর পয়সা আছে। লী ক্রিডি যদি মক্কেল হন তাহলে পয়সার ব্যাপারটা ভুল নয়। তার চারদিকে স্তাবক, চ্যালা, জো হুজুর লোক, সেক্রেটারীর অভাব নেই যারা আমাদের মত

লোককে তার কাছেও ঘেষতে দেবে না। জ্যাককে কি ভাড়া করেছিলেন তিনি? কেন? তাকে প্রশ্ন করা সহজ হবে না।

মুড ফিরিয়ে আনতে এক চুমুক হুইস্কি পান করি। অতঃপর টেলিফোন। রিসিভার তুলে ধরি–গ্রীভসকে দেবেন, কথাটা সুইচ বোর্ডের মেয়েটিকে বলি।

অল্প বিরতির পর লাইনের ওপার থেকে আসে গ্রীভসের গলা। বলি একটা টেলিফোন করার ছিল। আপনার সুইচ বোর্ড ক্লিয়ার তো! ইচ্ছে করেই একটু রহস্য রাখি কথায়।

–ভয়ের কিছু নেই। একটা পুলিশ, লাইনে আড়ি পেতেছিল। এইমাত্র চলে গেল।

ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন নামিয়ে আবার রিসিভার তুলে মেয়েটির কাছে লী ক্রিডির লাইন চাইলাম।

মেয়েটা একটু ধরতে বলে, অল্পক্ষণ বাদেই পুরুষ কণ্ঠ ভেসে আসে–আমি লী ক্রিডির বাড়ি থেকে বলছি।

মিস্টার ক্রিডিকে দেকেন? আমার কণ্ঠে ব্যক্ততা।

আপনার নামটা যদি বলেন স্যার, আমি মিস্টার ক্রিডির সহকারীকে দিতে পারি।

লিউ ব্রান্ডন আমার নাম। মিস্টার ক্রিডির সহকারীকে চাই না, মিস্টার ক্রিডিকেই চাই।

–যদি একটু ধরেন, আমি ক্রিডির সহকারীকে লাইন দিতে পারি। ঠাস করে যেন চড় পড়লো গালে। কণ্ঠস্বরের একঘেয়েমি। আর একই কথার পুনরাবৃত্তি যেন অপমানিত করে। এরপর লাইনের মধ্যে কাঁ–কে কট শব্দ। ছেঁড়া ছেঁড়া কথার আভাস। শেষে স্পষ্ট শোনা গেল হ্যামারস্কাল্ট হিয়ার। কে বলছেন?

–লিউ ব্রান্ডন। আমি মিস্টার ক্রিডিকে চাই।

মিস্টার ব্রান্ডন। আপনার কি দরকার? গলায় রুক্ষতা স্পষ্ট।

–সেটা মিস্টার ক্রিডি বলবেন, যদি আপনাকে জানানো দরকার মনে করেন। আমার সময় নষ্ট না করে লাইনটা দিন।

তার সাথে কথা বলা অসম্ভব। কি বলতে চান, যদি সামান্য আভাস দেন। আমি তাকে বলবো। তিনি পরে আপনাকে ফোন করতে পারেন।

বুঝলাম রাস্তা বন্ধ। আমি রূঢ় ব্যবহার করলে আমার চালাকি ধরে ফেলবে লোকটা। সুতরাং শেষ অস্ত্রটি চুড়ি খুব মোলায়েম স্বরে বলুন, সানফ্রান্সিসকোর স্টার এজেন্সির সিনিয়র পার্টনার বলছি। তিনি অপেক্ষা করছেন আমার জন্য। তাকে দেবার জন্য একটা রিপোর্ট আছে।

–তাই নাকি? কণ্ঠে বিস্ময়। ঠিক আছে মিস্টার ব্রান্ডন বলবো তাকে। পরে আপনাকে ফোন করছি। আপনার ফোন নম্বর কত?

নাম্বার জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিলাম। সিগারেট নিভিয়ে হুইস্কি শেষ করে চোখ বুজলাম। ভীষণ টেনসনের পর কখন চোখ লেগে গেছে। হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো। ক্ষিপ্র হাতে রিসিভার তুলে নিলাম। মনিবন্ধে তাকালাম। প্রায় পনেরো মিনিট ঘুমিয়েছি।

মিস্টার ব্রান্ডন?

–হ্যাঁ। হ্যামারস্কাল্টের গলা চিনতে পারলাম।

–আজ দুপুর তিনটের সময় মি. ক্রিডি আপনাকে ডেকেছেন। হ্যাঁ দয়া করে সঠিক সময়ে আসবেন। আজ দুপুরে মিঃ ক্রিডির বহু অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তার থেকে মাত্র কয়েক মিনিট সময় আপনাকে দিতে পারবেন।

–সেই যথেষ্ট। বলে ফোন ছেড়ে দিলাম। ক্রিডি হয়তো জ্যাকের মক্কেল। হয়তো সেজন্য ঐ স্তরের একজন লোক আমার মত লোককে সময় দিতে রাজি হয়েছেন।

***

বহুদুর থেকে চোখে পড়ে লী ক্রিডির সাম্রাজ্য। বাড়ি যেন রাজপ্রাসাদ তিনতলা উঁচু। বিশাল বিশাল জানালা। টেরেস। নীল টালির ছাদ। লতানো ফুল গাছ ঢেকে রেখেছে সাদা দেওয়াল।

হোটলের বাইরে সিপ্পির ব্যুইক রেখে গেছিল পুলিস। সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বুইকটা। পুলিশ না সিপ্পি। কে ক্ষতি করেছে গাড়ির? সম্ভবতঃ সিপ্পিই, সেই ব্যুইকটার সওয়ার

হয়ে ক্রিডির সাথে দেখা করতে ছুটেছিল। বুইক ব্যবহার করে ট্যাক্সি খরচ বাঁচানো গেল। পেনিনসুলা থেকে প্রাইভেট রোডে পড়লাম। সামনের সাইনবোর্ড বলছে–থর এস্টেটের সাক্ষাৎপ্রার্থীরাই শুধু এপথ ব্যবহার করতে পারে, অন্যরা নয়। ..

আরো কিছুদূর গিয়ে চোখে পড়ল লাল–সাদা পোল। তারপর ছোটখাটো সাদা গার্ড অফিস। এখানে রাস্তা ব্লক, দুজন সাদা পোষাকের গার্ড এগিয়ে এল। ওরা কাছে আসতে বলি–মিঃ ক্রিডির সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।

ওদের একজন এগিয়ে আসে–নাম কি?

নাম জানাই। আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ওরা ব্যারিকেড তুলে নেবার নির্দেশ দেয়। বলে সোজা যান। বাঁদিকে ঘোরার মুখে ছনম্বর সারিতে গাড়ি রাখবেন। বাঁদিকের মোড়ে, ছনম্বর সারিতে গাড়ি রাখলাম। দেখি, ওক কাঠের বিভিন্ন ফলকে বাটি অক্ষর জ্বলজ্বল করছে।

সহসা আমার পিছনে কে যেন বললো–যত্ত সব পয়সার অপচয়। ঘুরে তাকাই। সাদা পোষাকের থলথলে বেঁটে এক গার্ড। তার সন্দিগ্ধ চোখ দুটো আমার সর্বাঙ্গে ঘুরে যায় কাকে খুঁজছেন?

–ক্রিডিকে। ঘড়ির দিকে তাকাই। তিনটে বাজতে আর মিনিট বাকি। অগত্যা বলি– তিনটের সময় তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, তিনি অপেক্ষা করা পছন্দ করেন না।

–হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যান, লোকে তার দেখা পাবার জন্য তিন চার ঘণ্টা বসে থাকে। চলেই যাচ্ছিলাম, চকিতে মাথায় মতলব খেলে যায়। ঘুরে দাঁড়াই–আজ সন্ধ্যা ছটায় সময় হবে আপনার?

–আজ সন্ধ্যা ছটায় আমার অনেক কাজ, বিড়বিড় করে সে।

–এই পুরোনো মালিকের কাছে বারো মাস কাজ করেছি। আজ চাকরি ছেড়ে দিয়ে পেটপুরে মদ খাবো। সেলিব্রেট করবো। ব্যথা ভুলে থাকবো কেন?

–আজ আমিও সেলিব্রেট করবো। যদি অন্য কারোর সঙ্গে আপনাকে বসতে না হয়, তাহলে আসুন না, আমরা একসঙ্গে এনজয় করবো।

–আমার মেয়ে আমার মদ খাওয়া বরদাস্ত করে না, ভাবছিলাম আজ একা একা খাবো ভালোই হল, একজন সঙ্গী জুটে গেল। ঠিক আছে, বলুন, কোথায় আর কখন?

ধরুন ছটায়। ভাল জায়গা জানা আছে আপনার?

–সামস কেবিন। যে কেউ বলে দেবে কোথায় জায়গাটা। আমার নাম টিম। টিম ফাল্টন।

–আমি লিউ ব্রান্ডন। আবার দেখা হবে, চলি। তাকে ছেড়ে একসাথে তিন তিন ধাপ সিঁড়ি টপকে উঠি। বাঁদিকে লম্বা টেরেস পেরিয়ে প্রবেশ পথ।

মাত্র এক মিনিট বাকি। ডোর বেল বাজাই। দরজা খোলে তৎক্ষণাৎ। ছফুট চার ইঞ্চি দীর্ঘ– হলিউডের বাটফলারের ধরনের পোষাক পরিহিত রোগা প্রৌঢ় অল্প মাথা নুইয়ে

একধারে সরে দাঁড়ান। আমি ঢুকি। ওরে বাবা। কি মস্ত হল ঘর। ছছটা ক্যাডিলাক একসাথে এখানে গ্যারাজ, করা যায় অনায়াসে।

–আপনি মিস্টার ব্রান্ডন?

–ঠিক ধরেছেন।

আমি তাকে অনুসরণ করি। হল পেরিয়ে খানিক খোলা জায়গা। এখানে বোদ বড় তীব্র। আবার দরজা পেরিয়ে দীর্ঘ ঘর।

ছজন ব্যবসায়ী অপেক্ষারত। উদগ্রীব। তাদের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ।

আমি বসে টুপি খুলে হাঁটুতে রেখেকড়িকাঠের দিকে চেয়েরইলাম। তিনটে বেজে তিন। সশব্দে দরজা খোলে। এক যুবক, দীর্ঘকায়, শীর্ণ, চামড়ায় আভিজাত্যের জৌলুস। পরনে কালো কোট ট্রাউজার, কালো টাই, ব্যবসায়ী দুজনই উঠে দাঁড়ায়। প্রত্যেকে ভাবছে, বুঝি তারই ডাক এল।

যুবকের নির্দয় শীতল চোখ সবাইকে ছুঁয়ে আমাকে বিদ্ধ করে–মিঃ ব্রান্ডন? মিঃ ক্রিডি আপনাকে ডাকছেন। উঠে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন বলে ওঠে, ক্ষমা করবেন মিঃ হ্যামারস্কাল্ট, আমি কিন্তু বেলা বারোটা থেকে অপেক্ষা করছি।

হ্যামারস্কাল্টের দৃষ্টিতে ভৎর্সনা। –আমি কি করতে পারি? মিঃ ক্রিডি যা ভালো বুঝবেন। উনি চারটের আগে ফ্রি হবেন না।

ছোট্ট লবি ও দুটো দরজা পেরিয়ে আমরা এসে থামলাম মেহগনি কাঠের জেল্লাদার দরজায়।

সে ধাক্কা দিয়ে দরজার পাল্লা খুলে ভেতরে তাকায়। বলে ব্রান্ডন এসেছেন, স্যার। পাশে সরে দাঁড়ায় সে আমি ভেতরে ঢুকি।

এই ঘর মনে পড়িয়ে দেয় ফিল্মে দেখা মুসোলিনির সেই প্রখ্যাত অফিস। প্রায় ষাট ফুট লম্বা। বহুদূরে দুটো প্রকাণ্ড জানালা। যেখান দিয়ে ভেসে ওঠে সমুদ্র আর থর বে। অনায়াসে বিলিয়ার্ড খেলা যায় এমন একটা ডেস্ক মাঝখানে। ঘরের অন্য অংশে গুটি কয়েক চেয়ার। দেওয়ালের হ্যাঁঙারে ঝুলন্ত স্যুট দুটো। একটা অয়েল পেন্টিং, এত কালো–আসল না নকল, বোঝা দায়।

ডেস্কের অপর প্রান্তে ছোটোখাটো একটা মানুষ। ধূর্ত দৃষ্টি। চশমা কপালে তোলা। ধূসর চুল, খুব অল্প। হাড় সর্বস্ব শক্ত করোটি। দৃঢ় মুখ।

আমি ধীরে এগিয়ে যাই। প্রখর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ক্রিডি যেন আমার শিরদাঁড়ার হাড়গুলোও দেখতে পাচ্ছেন। ওনার ডেস্কে পৌঁছতে টের পাই, আমি ঘেমে উঠেছি।

চেয়ারে হেলান দিয়ে উনি চেয়ে আছেন। দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্য। অনেকক্ষণ স্তব্ধতার পর মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন–কি চান আপনি?

–আমার নাম ব্রান্ডন, সানফ্রান্সিসকোর স্টার এনকোয়ারি এজেন্সি থেকে আসছি। আমার পার্টনারকে আপনি চারদিন আগে ভাড়া করেছিলেন।

দপ করে নিভে গেল মুখের আলো। বললেন–আমি ভাড়া করেছি কি করে এ ধারণাহল?

কথাটা তার ক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে। তথাপি লড়ে যাই–আমাদের সব মক্কেলের রেকর্ড রাখি আমরা। অফিস ছাড়ার আগে সিপ্পি লিখে রেখে গেছে। আপনি তাকে ভাড়া করেছেন।

–সিপ্পি কে?

আমার পার্টনার। যাকে আপনি ভাড়া করেছিলেন।

আমার অনেক অদরকারি কাজে আমি প্রতি সপ্তাহে কুড়ি পঁচিশ জনকে বহাল করি। কই, সিপ্পি নামের কোন নামতো মনে পড়ছে না। আপনি কি জন্য এসেছেন? কি চাই আপনার?

–আজ সকালে সিপ্পি খুন হয়েছে। ক্রিডির অন্তর্ভেদী চোখে চোখ রেখে বলতে থাকিও যে কাজ করছিল, আমি ভাবছিলাম, আপনি সে কাজের দায়িত্ব আমাকে দিতে পারেন।

কাজটা কি? গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করেন তিনি। জানতাম, আগে হোক পরে হোক, প্রশ্ন উঠবেই। এবং এই সেই মোক্ষম ও শেষ সীমান্ত। উত্তর আমার জানা নেই, কৌশলে জেনে নিতে হবে। বললাম–আমার চেয়ে আপনিই তা ভালো জানেন।

মুখ থমথমে। অন্ধকার। চিন্তিত দেখাচ্ছে। চার সেকেন্ড চুপ থাকার পরে টেবিলে ঘন্টার বোতামে হাত রাখেন তিনি।

মুহূর্তে দরজা খুলে উদয় হয় হ্যামারস্কাল্ট। তার দিকে হৃক্ষেপ করে হাঁক পাড়েন–হার্জ, হার্জ।

–এক্ষুনি, স্যার। চলে যায় সে।

চোখ নিচে। টেবিলে আঙুল বাজান ক্রিডি। আরো পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড কেটে যায় শব্দহীন।

দরজা খোলার শব্দ হয়। এক বেঁটে মোটা লোক ঘরে ঢোকে। তার বাঁ কান বেঁকে মাথার সাথে মিশে গেছে। কোনো অপকর্মের সাক্ষী। মুখ জুড়ে হাড়বিহীন বিরাট নাক, বুনো আক্রোশ ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে, কাঁধের কাছে ছড়ানো কালো চুল। পরনে ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার ও সাদা স্পোর্টস কোট। টাই–এ হাতে আঁকা হিজিবিজি ছবি।

অতিদ্রুত টেবিলে এসে দাঁড়ায় সে, তার শরীর বুঝি ব্যালে নাচিয়ের মতো ভারহীন। আমাকে দেখিয়ে বলেন ক্রিডি–একে দেখে চিনে রাখো হার্জ। একে চোখে চোখে রাখার দরকার হতে পারে। হার্জ তাকায় আমার দিকে। আমার সর্বাঙ্গ জরিপ করে তার হিংস্র দুটি চোখ। ভাবলেশহীন চোখ, –দেখলে চিনতে পারবো, বস্, হার্জের গলা নরম। বস্–এর ইঙ্গিতে চলে যায় সে।

ক্রিডি বলে–এনকোয়ারি এজেন্টদের আমি পছন্দ করি না। আমার মনে হয় ঐ নোংরা লোকগুলো ব্ল্যাকমেলিং–এর সুযোগ খোঁজে। মিঃ সিপ্পি বা ঐ ধরনের কাউকে আমি ভাড়া করিনি। করার কথা ভাবিনি। আপনাকে পরামর্শ দেবোযথা শীঘ্র এশহর ছেড়ে চলে

যান। আমি আপনার মিঃ সিপ্পিকে চিনি না। আপনার সঙ্গে কোন কাজ কারবার করতেও চাই না। আপনি বেরিয়ে যান এখনি। নতুবা যার মূল্য আছে–এমন কিছু বলুন।

আমি হাসি। ক্রিডির অন্তর্ভেদী চোখে চোখ রাখি। ঐ চোখে রাগের বহ্নি। রাগ আমারও কম হয়নি। বোধহয় জীবনে এরকম ক্ষিপ্ত কখনো হইনি। হাসতে হাসতে বলি–হ্যাঁ, আমার কিছু বলার আছে। প্রথমতঃ মিঃ ক্রিডি, আমি সঠিক জানতাম না আপনি সিপ্পিকে ভাড়া করেছিলেন কিনা। এখন জানলাম। ঘটনাচক্রে সিপ্পি তার ব্লটিং পেপারে আপনার নাম লিখে রেখেছিল। কাজে নেমে, সেটাই ছিল আমার একমাত্র সূত্র। কাগজে আঁকিবুকি কাটা তার স্বভাব। তাই ভেবেছিলাম, কেউ হয়তো আপনার নামটা উত্থাপন করায় সিপ্পি তা লিখেছিল খেয়ালবশে। এখন জানলাম তা নয়। আজ সকালে আমি যখন ফোন করি, তখন নিশ্চিৎ ছিলাম আপনি দেখা করবেন না। আপনার শুরের কোনো মানুষ আমাদের মত তুচ্ছ এনকোয়ারি এজেন্টকে পাত্তা দেবেন না, যদি না, সত্যি প্রয়োজন থাকে বা কোন কিছু গোপন করার থাকে। তাছাড়া দুজন ব্যবসায়ীকে, যার মধ্যে একজন তিনঘণ্টা অপেক্ষারত, বাদ দিয়ে আমাকে বেশি গুরুত্ব দেবার কারণ নিশ্চয়ই আছে। আপনি তিন মিনিটের বেশি কারোর কথা শোনেন না, আমি জানি। আপনি যখন জানলেন কত ক্ষুদ্র আমি তখনই আপনি আপনার পোযাগরিলাকে ছুঁড়ে দিলেন আমার দিকে। ভাবলেন, ভয়ে ল্যাজ গুটিয়ে পালাবো আমি হোটেলে। আর সেখান থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পিঠটান দেবো। সবাই অত সহজে ভয় পায়না মিঃ ক্রিডি, তার মধ্যে একজন আমি।

–বলা শেষ হয়েছে?

সম্পূর্ণ নয়। এখন আমি নিশ্চিত হলাম, সিপ্পিকে আপনি ভাড়া করেছিলেন। এবং সে এমন কিছু উন্মোচন করেছিল যা কারোর কাছে ভাল লাগেনি, তাই সে খুন হয়। আমি জানি আপনার।

কাছে সেই সূত্র আছে যা জানলে পুলিশ খুনীকে ধরতে পারে। এবং আপনি চাইবেন না নিজেকে এই মার্ডার কেসের সঙ্গে জড়াতে। কারণ তাহলে প্রকাশ হয়ে যাবে আপনি কেন সিপ্পিকে ভাড়া করেছিলেন। আমার অভিজ্ঞতা বলে, কোন মিলিয়ার যখন আপন বাসভূমি থেকে তিনশো মাইল দূরের কোন এজেন্টকে ভার করার কষ্ট স্বীকার করেন, তখন বুঝতে হবে তিনি স্থানীয় বড় এজেন্টকে কাজের ভাড় দিয়ে সবকিছু ফাস করতে চান না। আমার প্রিয় সিপ্পি মৃত। পুলিশও যদি তার খুনীকে ধরতে অপারগ হয়, আমি হয়তো পারবো। হার্জ বা মিঃ ক্রিডি যাই করুন, আমি আমার কাজ করে যাব।

ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়াই–দ্যাটস অল। থাক, আপনার পোষা গুণ্ডা ডাকতে হবেনা। আমি চলে যেতে পারবো নিজেই।

দরজার দিকে হেঁটে যাই। শুনতে পাই ক্রিডি বলছেন–আমি কিন্তু আপনাকে শাসাইনি।

দরজা খুলে বেরোই। বাটলার এগিয়ে দিতে আসে। ক্রিডির শেষ কথাটা মাথার মধ্যে লাফাতে থাকে পিং পং বলের মত।

***

হোটেলের সামনে দেখি পুলিশের গাড়ি পার্ক করা। বুইক থেকে নামতেই পুলিসের গাড়ি থেকে এগিয়ে আসেন ক্যান্ডি–আপনাকে ডেকেছেন ক্যাপটেন।

হেসে বলি–যদি না যাই।

–ভাল কথায় না এলে জোর খাটাবো। এখন মর্জি আপনার। পুলিশের গাড়ির পিছনের সিটে বসতে বসতে বললাম কি জন্য ডাকলেন?

জানি না। মনে হল তার মেজাজ ভাল নেই।

–খুনীকে সনাক্ত করতে পেরেছেন?

–এখনো পারিনি। তবে চেষ্টা চলছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টার ঘেঁষে গাড়ি থামে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে পুলিশ ফাঁড়ির পরিচিত ঘ্রাণ নিতে নিতে সিঁড়ি টপকে সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকি।

ক্যান্ডি সতর্ক করে দেন সাবধানে পা ফেলবেন। ক্যাপ্টেন ক্ষেপলে বিপদে পড়বেন। তিনি একটা বন্ধ দরজার ঘা দেন। ঘুরিয়ে দরজা একটু খুলেই আমাকে ঠেলে দেন ভেতরে।

ধোঁয়াচ্ছন্ন ঘর। বিরাট টেবিলের ওপ্রান্তে বসে আছেন পর্বতসম মানুষটি। বয়স হয়েছে। তথাপি শরীরের কাঠামো বেশ শক্ত। কপালে ঝাঁপিয়ে পড়া চুল। মস্ত মুখে কঠোর হিংস্রতা।

দরজা ভেজিয়ে চলে যান ক্যান্ডি।

ব্রান্ডন? সিগারেটে জোরে টান মেরে বলেন ক্যাপ্টেন–আপনি আমাদের কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন। এই শহর ছেড়ে কখন চলে যাচ্ছেন?

জানিনা। আশা করি, এক সপ্তাহের মধ্যে!

–কি বললেন! এক সপ্তাহ ধরে কি রাজকাজ করবেন এখানে?

–প্রকৃতি দেখবো। সাঁতার কাটবো। মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করবো।

–হ্যা! আপনি আর এই মার্ডার কেসে মাথা গলাবেন না, তাই তো?

–আমি সাগ্রহে লেফটেন্যান্ট র‍্যানকিনের তদন্তের উন্নতির দিকে তাকিয়ে আছি। আমার সাহায্য ছাড়াই কাজটা তিনি সমাধান করতে পারবেন, ভরসা আছে।

–সে আপনার সহজ–সরল স্বীকারোক্তি। তবে হত্যাকারীকে ধরতে পারলে পিষে

–তা আন্দাজ করতে পারি ক্যাপ্টেন।

–বটে? ছেলেমানুষি করবেন না। এই ধরনের কেসে মাথা গলিয়ে নিজের দুর্ভাগ্য ডেকে আনবেন না। বুঝেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হঠাৎ মুখ খিঁচিয়ে ওঠেন–আপনি শুধু জঘন্য বদমাইশই নন, ধোকাবাজ। এসব ঝুট ঝামেলা থেকে দূরে থাকুন, তাহলে হয়তো বাঁচতে পারেন। এ অফিসে ফের যদি আসেন তাহলে এমন অভিজ্ঞতা হবে জীবনে ভুলবেন না। মনে রাখবেন, ফের যদি বেচাল দেখি, একেবারে ফটকে পুরে দেবো। বদমাশদের পেঁদিয়ে ঠাণ্ডা করতে আমরা ভালই জানি। ক্যান্ডি...ক্যান্ডি–হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন তিনি, এই ধোঁকাবাজটাকে নিয়ে যাও, একে দেখলে আমার বমি আসে।

দরজা খুলে ক্যান্ডি ঢোকেন। ক্যান্ডির সাথে বেরিয়ে যেতে গিয়ে চকিতে থামি, ঘুরে প্রশ্ন করি–আচ্ছা, লী ক্রিডি কি আপনাকে বলেছে আমার সঙ্গে কথা বলতে?

ক্যাপ্টেনের হাত নিসপিস করে–তার মানে?

মিঃ ক্রিডি তার কাজের জন্য সিপ্পিকে ভাড়া করেন। কাজ করতে গিয়ে খুন হল সিপ্পি। ক্রিডি চান ব্যাপারটা চেপে যেতে। সম্ভবতঃ তিনি ভয় পাচ্ছেন। সাক্ষী হিসেবে কোর্টে তলব হতে পারেন। এবং প্রশ্ন উঠতে পারে কেন তিনি সিপ্পিকে ভাড়া করেছিলেন। এ নিয়ে তার সাথে কিছু কথাও হয় আমার। তিনি তার পোষা গুণ্ডা হার্জকে দিয়ে আমায় ভয় দেখান যাতে আমি আর জল না ঘোলা করি। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি উনি সাবধান হয়েও হননি! আবার আমাকে শাসাচ্ছেন আপনাকে দিয়ে।

আঁৎকে ওঠেন ক্যান্ডি। ক্যাপ্টেনের চোখ মুখের রং বদলায়। চেয়ার ছেড়ে ধীরে দাঁড়ান–ও, এখনোবাকি আছে কিছু দেখছি দাঁত কিড়মিড় করে কথাগুলো বলেই সজোরেকষালেন একড়ে।

মারটা বেশ যুৎসই। ভার না সামলাতে পেরে মাটিতে সটান পড়ে যাই। আমাকে তিনি ওঠার সময় দেন। তারপর তার রক্তজমাট কালো মুখটা আমার মুখের কাছে এনে বলেন–বেরিয়ে যা ধোকাবাজ। পরক্ষণেই ফিসফিসিয়ে বলেন–মার আমাকে, মার।

আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল ঝেড়ে দিই এক ঘুষি। কিন্তু জানি, উনি চাইছেন আমি হাত ওঠাই। মারি। জানি ঘুষি নয়, আমি একটু শাসালেই মুহূর্তে আমায় ফটকে পোরা হবে। অগত্যা, স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকি।

ক্যান্ডি ও ক্যাপ্টেন পরস্পরের দিকে তাকান। তারপর পিছু হটতে হটতে ক্যাপ্টেন চিৎকার করে বলেন–হতভাগাকে এখুনি দূর করে দাও। নইলে খুন করে ফেলবো।

ক্যান্ডি আমার কাঁধ খামচে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যান। দরজার বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। তার রক্তজমাট মুখ থেকে রাগ রিক্তি মিশ্রিত কটাকথা কানে আসে–আগেই সাবধান করেছিলাম। তবু গন্ডগোল পাকালেন। এখন জাহান্নামে যান।

সিঁড়ি ভেঙে পথে নামি।

.

০৩.

সেন্ট রাফাইল সিটির শেষ প্রান্তেহতশ্রী সা কেবিন। সমুদ্রের খাড়ি থেকে যেন হঠাৎগজিয়ে উঠেছে স্টীলের স্তম্ভের ওপর কাঠের রেষ্টুরেন্টটি।

ছটা বাজতে পাঁচ।

পার্কিং জোন–এ গোটা তিরিশেক গাড়ি। যার মধ্যে একটাও ক্যাডিলাক কিংবা ক্লিপার নেই। সরু জেটি পেরিয়ে বার। জানলার ধারে, কোনের দিকে একটা টেবিলে গিয়ে বসি। ওয়েটার টেবিল মুছে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। অর্ডার দিই, এক বোতল ব্ল্যাক লেবেল, বরফ আর দুটো গ্লাস। ছটার কয়েক মিনিট পরে ঢোকে টিম ফাল্টন। পরনে সবুজ ব্যাগি ট্রাউজার ও বুকখোলা নীল জামা। জ্যাকেট ঝুলিয়েছে কাঁধে।

চারদিকে সে দৃষ্টি বোলায়। আমায় দেখে হাসে। এগিয়ে এসে বসে আমার টেবিলে–এই যে মশাই, শুরু করে দিয়েছেন। আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারলেন না?

বোতল খুলিনি এখনো। সহাস্যে বলিবসুন। তা, ছুটি পেয়ে কেমন লাগছে।

–লোকটার কাছে এতদিন যে কি করে কাজ করলাম, তাই ভাবছি।

নখ দিয়ে বোতলের ছিপি খোলে টিম। দুগ্লাসে মদ ঢেলে আমি বরফ মেশাই। তারপর একগ্লাস এগিয়ে দিই।

আমরা গ্লাসে গ্লাস ঠেকাই। চিয়ার্স। চুমুক দিই গ্লাসে। সিগারেট ধরাই। পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখি।

–ভাল কথা, মানুষটাকে কেমন দেখলেন, চমৎকার, তাই না? টিম প্রচ্ছন্ন কৌতুকে প্রশ্ন তোলে।

–হ্যাঁ, প্রকাণ্ড ঘর আর ঐ অন্তর্ভেদী চোখ। ঘেন্না লাগে ওর সঙ্গে কাজ করতে।

–আপনি একথা বলছেন ভাই! আমি একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছি অন্যত্র। দেখাশোনা করি এক বৃদ্ধার। বড় ভালোমানুষ বৃদ্ধা।

–বৃদ্ধার কথা পরে হবে, আচ্ছা, ঐ হার্জ লোকটা কেমন? টিম ভ্রূকুটি করে, –একি করছেন! মাটি করবেন নাকি সন্ধ্যেটা। ওকে নিয়ে পড়েছেন দেখছি আপনি।

না মানে, যখন যাই ক্রিডির সঙ্গে দেখেছি লোকটাকে। এমন ঝাঁপট মেরেছিল আমায় লোকটা! কে লোকটা? কি করে ঐ অদ্ভুত চরিত্রের সঙ্গে ক্রিডি নিজেকে খাপ খাওয়ান?

–হার্জ আগে গুণ্ডা ছিল। এখন ক্রিডির দেহরক্ষী ও কর্মী। এই এক রোগ বড়লোকদের। সর্বদা ভাবেন লোকে এই বুঝি তাকে গুলি করতে বা ছুরি মারতে আসছে।

–যতটা দেখায়, ততটা কি নিষ্ঠুর হার্জ?

মাথা নাড়ে টিম। –হ্যাঁ ঠিক ততটাই। কোন ফাঁকি নেই ক্রিডির নির্বাচনে।

তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে ক্যাপ্টেন ও হার্জের মধ্যে তো কোন ফারাক নেই। আমি প্রশ্ন করি–আজ সমুদ্রতীরে যে খুন হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছেন খবরের কাগজে?

সেই রকমই যেন সান্ধ্য কাগজে দেখলাম। এ প্রশ্ন হঠাৎ?

মৃত ব্যক্তি আমার পার্টনার। আমার মনে হচ্ছে কয়েকদিন আগে ক্রিডি তাকে ডেকে পাঠান। আপনি তাকে দেখে থাকবেন হয়তো।

ক্রিডি ডেকে পাঠিয়েছিলেন? উৎসাহিত হয়ে টিম বলে–তাহলে দেখেছি হয়তো। এ সপ্তাহের বেশির ভাগ আমি গেট–এ ডিউটি করেছি। তাকে কেমন দেখতে?

আমি নিখুঁত বর্ণনা দিই সিপ্পির! জানি যদি সিপ্পিকে টিম দেখে তাহলে ভুলবেনা। আমার ধারণা মিলে যায়। দ্বিগুণ উৎসাহে সে ফেটে পড়ে–হা, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি তাকে। লম্বা চওড়া লাল চুল–লোগার পথ ছেড়ে দেয় তাকে, আমি ফটকের সামনে তখন তার নাম জিজ্ঞেস করিনি।

তাকে দেখেছেন, একথা স্বীকার করতে পারবেন? ধরুন, যদি আপনাকে সাক্ষী দিতে হয় কোর্টে?

শেষ মদটুকু গলাধঃকরণ করে বলল সে–আলবাৎ স্বীকার করবো। গত মঙ্গলবার এসেছিলেন।

এই–ই যথেষ্ট। গাড়ির কথায় চিত্রটা আরও স্পষ্ট হয়। তাহলে ঠিকই ধরেছি। ক্রিডির সাথে জ্যাক সিপ্পি দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু কেন?

কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন করে টিম–আপনি বললেন, খুন হয়েছেন!

–হ্যাঁ, পুলিশ ভাবছে কোন ঠগবাজ মেয়ের পাল্লায় পড়ে প্রাণ হারিয়েছিল। হতে পারে। উনি বড্ড বেশী পছন্দ করতেন মেয়েদের।

পুলিসের কাছে গেছিলেন?

–হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন ক্যাচেন লোকটা যেন কেমন। তাই না?

–যা বলেছেন। ক্কচিৎক্রিডির সাথে দেখা করতে আসেন। বছরে অন্ততঃকরে চারেক। ক্রিডির ঝুট ঝামেলা সামলান বোধহয়। শুনলে অবাক হবেন, রাতে যত নাইট ক্লাব ও বেশ্যালয়গুলো খোলা থাকে। ক্যাচেন পরোক্ষভাবে সেগুলোর দেখভাল করেন।

–এসবের কি সম্পর্ক ক্রিডির সাথে?

–আরে। এ শহরের অধিকাংশই তার কেনা। এসব যারা চালায় ক্রিডি তো তাদের কাছে সরাসরি টাকা নিতে পারেন না, তাই ভাড়া আদায় করেন পরোক্ষভাবে। ক্যাচেনকে তার দরকার।

–তিনি বিবাহিত। না?

–কে? ক্রিডি? যদুর জানি, বিয়ে করেছিলেন চারবার। তার বেশিও হতে পারে। ব্রিজিৎ বদ তার বর্তমান স্ত্রী। তাঁকে কখনো দেখছেন? প্রাক্তন ফিল্মস্টার।

–একবার। সত্যি, দেখার মত।

–এখনো তাই। তবে তার সতীনের মেয়েকে তিনি দু–চোখে দেখতে পারেন না। আমি দু একবার দেখেছি মেয়েকে। ওহ, চোখ জুড়িয়ে যায়।

–তিনি কি বাড়িতেই থাকেন?

না। আগে ছিলেন। ঘরটা কেউই এখন ব্যবহার করেন না। যখনই বুড়ো ক্রিডি কোন পার্টি দেন, মেয়ে মর্গটই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর সম্মা ব্রিজিৎবাইরে থাকেন। অন্ধকারে, ঠাণ্ডায়, লোকচক্ষুর আড়ালে। ব্রিজিৎমর্গটের বনিবনা নেই। প্রায়ই ঝগড়া হত বলে, জিনিসপত্র নিয়ে মর্গট চলে যান। ফ্রাঙ্কলিন বুলেভার্ডের এক ফ্ল্যাটে থাকেন। সেই থেকে মেয়েকে হারিয়েছে বাপ। আমিও দেখতে পাইনি তাকে আর। ক্রিডির মত ব্রিজিৎ শুধুই বেদনা দিয়েছে আমাদের। চির অসুখী, সর্বদা প্রলাপ বকছেন, সারাদিন ঘুমোচ্ছন, সারারাত বিনিদ্র কাটাচ্ছেন।

টিম বলে যায় মিঃ ক্রিডির সাথে থেকে কেউই সুখীনয়। সর্বক্ষণ টাকার জন্য স্বামীর ব্যস্ততা বরদাস্ত করবে কোন স্ত্রী?

উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা?

মিসেসের বর্তমান প্রেমিক ঝাকড়া চুলের নাদুস নুদুস যুবক জ্যাকুইস ফ্রিসবি। ফ্রেঞ্চ ও কানাডার মিশ্র রক্ত তার শরীরে।

সহসা খেয়াল করি আমাদের টেবিলের দিকে কে যেন এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের জন্য ভাবি হয়তো.ওয়েটার। খাবার আনছে। জানলার দিকে তাকাই আর তখনই ফাল্টনের

শ্বাস টানার শব্দ। দেখি, টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হার্জ। আমার দিকে দৃষ্টি। তার পেছনে অর্ধবৃত্তাকার করে দাঁড়িয়ে চারজন লম্বা চওড়া, ভয়ঙ্কর গুণ্ডা ধরনের লোক। বন্ধ আমার পালাবার পথ। হার্জের ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে হিংস্রতা। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নামলো হিমশীতল প্রবাহ।

হঠাৎ স্তব্ধ হল গুঞ্জন। সবকটা মাথা ঘুরে গেল। সবার দৃষ্টি শুধু আমার দিকে নিবদ্ধ। সঙ্গীন অবস্থা। আমার আর হার্জের মাঝে টেবিল। আমার চেয়ারের পেছনে দেওয়াল। গোলমালের গন্ধ পেয়ে অনেকেই নিঃশব্দে রেষ্টুরেন্ট ছেড়ে প্রস্থানের পথে। ছোট্ট টেবিল সামনে। হার্জের পেছনে কোন দেওয়াল নেই। চোখে পড়ে, ঘরের কোণে এক দীর্ঘকায় নিগ্রো। বার–এর পিছন দিক থেকে সামনে এসে দাঁড়ায়। জো লুইসের মত চেহারা। চওড়া ঠোঁটে ছদ্ম ক্ষমার হাসি। ক্ষিপ্র পায়ে সেই চার সাকরেদ দরজা পেরিয়ে হার্জের পাশে এসে দাঁড়ায়।

টেবিলের কোণা ধরে আমি আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছি। নরম স্বরে নিগ্রো বলে– বস্, এখানে গোলমাল করবেন না। যদি আপনাদের দুজনের মধ্যে কোনো বোঝাপড়ার দরকার থাকে, বাইরে গিয়ে করুন।

মাথা ঘুরিয়ে হার্জ নিগ্রোর দিকে তাকায়। চোখে সামান্য বিদ্যুৎ। ছারপোকা মনে হয় নিগ্রোটিকে। তড়িৎ হার্জের ডান মুষ্টি ছুটে যেতে দেখালাম। নিগ্রোর মুখে আঘাত হানে। প্রথমে টলে পিছিয়ে যায় সে। তারপর হাত–পা মুড়ে লুটিয়ে পড়ে।

চোখের নিমেষে ঘটে যায় সব।

টেবিলের দুই কোণা ধরে ছুঁড়ে দিই আমি। দুজন গুণ্ডা সমেত হার্জ পড়ে যায়। আমি লাফিয়ে উঠে চেয়ার তুলে নিই। চক্রাকারে ঘোরাই মাথার ওপর তুলে জায়গা ফাঁকা হয়। বেরিয়ে যাবার পথ পাই আমি। টিম একটা চেয়ার তুলেছে। কাছের একটা গুণ্ডার মাথায় সজোরে বসিয়ে দেয়। দড়াম করে পড়ে যায় গুণ্ডাটা। ওদিকে ষণ্ডা মার্কা লোক দরজা আটকে দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে একজন নিগ্রো। হার্জ ও তার নি সাগরেদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে। হার্জের মাথায় মেরে চেয়ারটা ভেঙেছে। লাঠির মত চেয়ারের দুটো পায়া আমার হাতে। এগুলো পশুর মত অতিকায় হার্জের বিরুদ্ধে নেহাতই নগণ্য।

দাঁত কিড়মিড় করে হার্জ। তার উদ্যত ডান হাত আঘাত করার আগেই আমি লাফিয়ে কাছে চলে আসি। মুখের মাঝামাঝি ঘুষি চালাই। জব্বর হয়েছে ঘুষিটা। মাথা টাল খায় হার্জের। সে সুযোগে পালাবার জন্য পা বাড়াই। অকস্মাৎ প্রবল বাঁ হাতের ধাক্কায় ফিরে আসি ফের হার্জের কাছে। হার্জের এক সাগরেদের কাছ থেকে এল মারটা।

চকিতে হার্জের কোমর জড়িয়ে ধরি আমি। তার একটা হাত কাঁধে তুলে নিয়ে, অর্ধেক ঘুরে, শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দিই। আমার মাথার ওপর দিয়ে তার শরীর রকেট গতিতে মাটিতে আছড়ে পড়ে। সারা বাড়ি কেঁপে ওঠে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ফাল্টনকে খুঁজি। সে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রুমালে মুখ ঢাকা। কনুই থেকে হাতটা ঝুলছে। তার অপর বাহু আকর্ষণ করে বলি বাইরে যাই, চলুন।

হার্জের এক চ্যালা পথ আটকে দাঁড়ায়। আমার মাথা লক্ষ্য করে ছুটে আসে। তড়িৎগতিতে মাথা ঘুরিয়ে পাঁজরে প্রচণ্ড জোরে এক ঘুষি চালাই। সেইসঙ্গে লাথি কষাই

পা লক্ষ্য করে। তারপর সেদিকে না তাকিয়ে টিমকে কোনরকমে টেনে নিয়ে দৌড়ই বেরুবার পথের দিকে।

বাইরে এসেও নিস্কৃতি নেই। সামনে সঙ্কীণ; দীর্ঘ জেটি। উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। শেষ প্রান্তে আলোকিত পার্কিং জোন।

টিম ভীষণ জখম। জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হার্জ দলবল সহ হাজির হবে।

টিম গোঙাতে থাকে–ছেড়ে দিন, এক পাও আর যেতে পারছি না। আপনি পালান ওরা ধরার আগে। ওর একটা হাত আমার মাথা ঘুরিয়ে কাঁধে রাখি। প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকি পার্কিং জোনের দিকে। হার্জ ছুটে আসছে জেটিতে। আমি টিমকে বলি দৌড়োন, ওদের আমি আটকাচ্ছি।

টিমকে ছাড়তে সে আপ্রাণ দৌড়ায়। ততক্ষণে হার্জ আমার মুখোমুখি। আমার পাশে ঘুরতে থাকে মুষ্ঠি যোদ্ধার ভঙ্গিতে। যেন শিকারের ওপর ঝাপানোর আগে বাঘের সতর্ক ভঙ্গি।

আমি স্থান বদলাই। এমনভাবে দাঁড়াই যাতে মাথায় ওপর দিয়ে আলো এসে লাগে হার্জের চোখে। ধন্দ করছে তার রাগী চোখদুটো। আমি মাথা ঠাণ্ডা রাখি।

খ্যাপা বাইসনের মত ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে আসে সে। আমি অল্প সরে দাঁড়িয়ে অব্যর্থ ঘুষি চালাই তার মুখে। হার্জের মাথাটা পেছন দিকে টাল খায়। সুযোগ বুঝে ডাইনে ঘুরে দ্বিতীয় আঘাত করি গায়।

আচমকা অনুভব করি আমার বাঁদিকে যেন হাতুড়ির ঘা পরে।

পিছু হটে যাই দু–পা। হার্জ এগিয়ে আসে। এবার এক লাথি, সে ছিটকে পড়ে। পিছু ফিরে দেখি টিমকে দেখা যাচ্ছে না আর। এই সুযোগ, এবার পালাই। এক দৌড়ে পার্কিং জোন–এ আসতে কানে আসে ভারী কণ্ঠের ডাক–এই ব্রান্ডন, এদিকে আসুন।

দেখি গাড়ির মধ্যে টিম বসে আছে। সামনের সিটে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিই। পেছনে, মাত্র কুড়ি গজ দূরে রাগে ফুঁসছে হার্জ। পার্কিং অঞ্চল ছেড়ে দুরন্ত বেগে গাড়ি ছোটাই। দু–পাশে সুদৃশ্য গাছপালা, নুড়ি বিছানো পথ গেছে বড় রাস্তায়। প্রধান সড়কে পড়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিই। পাঁচ মিনিটের মাথায় প্রার্থিত হাসপাতালের দরজায় গাড়ি থামাই। গাড়ি থেকে নেমে টিম বলে–এবার যেতে পারবো নিজে। আমি বোকা, পেটে কথা থাকেনা। সব খুলে বলেছি মাপনাকে।

–আমি দুঃখিত। আপনাকে এরকম পার্টি দেবার জন্য ডাকিনি। বিশ্বাস করুন। আমরা কেস করতে পারি হার্জের বিরুদ্ধে। সাক্ষী আছে অনেক।

–ঢের হয়েছে। আমি আর নেই এসবে। থাকলে বিপদে পড়ব। কালই মালপত্তর নিয়ে চলে যাবো এ শহর ছেড়ে। বহুৎ শিক্ষা হয়েছে। আর না।

অসহ্য যন্ত্রণায় নজ। টিম ফাল্টন এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকে যায়। আমি গাড়িতে উঠে হোটেলে করতে থাকি।

হোটেলে ফিরে স্নান শেষে বিছানায় শুলাম। মনে পড়ল, রাতের খাবার খাওয়া হয়নি। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত লাগছে।

রুম সার্ভিসকে স্যান্ডউইচ, মাখন রুটি ও বরফ শীতল এক পাঁইট বিয়ারের অর্ডার দিলাম।

শুয়ে শুয়ে ভাবছি সারাদিনের কর্মকাণ্ডের কথা। জানি, বাঘের গুহায় পা দিয়েছি। জানি না ততক্ষণ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারব। তাছাড়া হার্জকে কায়দা করলেও ক্যাপ্টেনের সাথে কি এঁটে উঠবো? যে কোন মিথ্যা চার্জে লকআপে ভরে দেবে।

এভাবে চিন্তা করতে করতে উঠে, মর্গটের ফোন নম্বর খুঁজি টেলিফোন ডাইরেক্টরী খুলে। ফ্রাঙ্কলিন বুলেভার্ডে ফ্ল্যাট তার। এইতো পেয়েছি। বড় হরফে লেখা ফ্রাঙ্কেন আর্মস।

দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনে দরজা খুলি। ওয়েটার উপস্থিত খাবার নিয়ে।

খাবার শেষ করে সিগারেট ধরাই। তারপর হোটেলের প্যাড থেকে কাগজ ছিঁড়ে জ্যাকের স্ত্রীকে চিঠি লিখতে বসি। সাড়ে দশটায় চিঠি লেখা শেষ হয়। চিঠিতে আমি তাকে স্বামী হারানোর জন্য ক্ষতিপূরণবাবদ এককালীন মোটা টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। জানি, এ নিয়ে দীর্ঘদিন তর্কাতর্কি করে বিশ্রীভাবে শেষে ভালরকম আদায় করবেন। আমাকে কখনোই পছন্দ করতেন না তিনি। যাই দিই, তিনি খুশী হবেন না।

কাগজটা খামে ভরে ঠিকানা লিখে ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রাখি আগামীকালের ডাকে দেব বলে। জ্যাকের জিনিষপত্র আমার ঘরে কেউ উঁই করে রেখেছে। কৌতূহলবশতঃ জ্যাকের সুটকেসগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নিই যাতে আপত্তিকর কিছু না থাকে। যা পেয়ে জ্যাকের স্ত্রী হতাশ বা দুঃখিত হয়।

কয়েকটা ফটোগ্রাফ ও চিঠি পাই যা প্রমাণ করে গত কয়েক বছর ধরে জ্যাক স্ত্রীকে ঠকাচ্ছিল। সেই ছবি ও প্রেমপত্রগুলো নোংরা ফেলার বাক্সে ফেলে দিই।

তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর কিছু পেলাম না। স্যুটকেসের গোপন খাপে হাত রাখতে উঠে এল একটি ম্যাচ-ফোল্ডার। নাইটক্লাব ও রেষ্টুরেন্টে এগুলো দেয় বলে কোথায় যেন বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। কালচে লাল সিল্কে মোড়া ম্যাচ-ফোল্ডারের ওপর সোনালি হরফে লেখা দ্য মাসকেটিয়ার ক্লাব ও তার ফোন নম্বর।

দুআঙুলের ফাঁকে দেশলাই বাক্সের মত ম্যাচ-ফোল্ডার নিয়ে ডিটেকটিভ গ্রীভসের কথা মনে পড়ে-এই শহরের সবচেয়ে বিত্তশালীদের ক্লাব। কি করে এই ফোল্ডার পেল জ্যাক? সেকি গেছিল ঐ ক্লাবে? তাকে যতটা জানি, ব্যবসায়িক কারণ ছাড়া বড়লোকদের ক্লাবে সে যাবে না।

ফোল্ডার পেয়ে যেন মাটি পেলাম পায়ের নিচে। একটু চিন্তা করে, ঘর ছেড়ে এলিভেটর ধরে নিচে লবিতে নাবি।

গ্রীভস কাছে পিঠে আছে কিনা খোঁজ নিই রিসেপশনে। ক্লার্ক জানায়–এইমাত্র তার অফিসে গেলেন। নিচের ঘরে, ডানদিকে চলে যান। আপনার কি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?

–ওহ এই চোখ, না। ওয়েটারকে স্যান্ডউইচ পাঠাতে বলতে, সে খাবার ছুঁড়ে মেরেছিল। তাই না, সেজন্য মনে কিছু করিনি। আমি এধরনের ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত।

ক্লার্ক তো কথা শুনে হাঁ। আর আমি সোজা অফিসে। খোলা দরজায় পা দিতেই নজর পড়ে নাতিদীর্ঘ ঘরে ছোট্ট টেবিলে গ্রীভস বসে আছে।

–আপনার মুখের চেহারা কেউ বদলে দিয়েছে দেখছি। উৎসুকভাবে বলে গ্রীভস।

–হ্যাঁ। ম্যাচ ফোল্ডারটা টেবিলে ছুঁড়ে দিই চমকে ওঠে গ্রীভস। –এটা এল কোত্থেকে?

–সিপ্পির স্যুটকেস থেকে।

বাজি রেখে বলতে পারি। কখনই সেখানে যাননি উনি। উনি সেই শ্রেণীর লোক নন। তার অত পয়সা বা খুটির জোর ছিল না যে সেখানে প্রবেশাধিকার পাবেন।

–কেউ নিয়ে গেছিল হয়তো, সেটা সম্ভব তো।

হতে পারে। একজন সভ্যবা মেম্বারতার পছন্দের লোককেক্লাবেআনতে পারেন। তবেঅন্য মেম্বাররা তাকে কোন কারণে অপছন্দ বা আপত্তি করলে সে সভ্যের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

জ্যাক হয়তো এটা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

–শুনুন যারা ঐ মাসকেটিয়ার ক্লাবে যান, তারা কখনোই নিজেদের চাপাকলির মত আঙুল ক্লেদাক্ত করবেন না এরকম ম্যাচ ফোল্ডার ছুঁয়ে। ভয় পাবেন ওঁরা। নির্ঘাৎ–এ জিনিস রাস্তায় পড়ে ছিল। বিস্তর জীবাণু লেগে আছে। তবে আমার যা মনে হচ্ছে কেউ ঐ ক্লাবে যেতেন তা প্রমাণ করতে জ্যাককে সাথে নিয়ে গেছিলেন, হয়তো ব্যাপারটা স্রেফ বাজি রাখার খেলা।

–মেম্বারদের লিস্ট কোথায় গেলে পেতে পারি? গ্রীভসের মুখে বুদ্ধিদীপ্ত হাসি। কাঁপার্ডের আড়াল থেকে অবিকল এই রকম একটা ছোট বই বের করে বললেন–হোটেল রিজাৎ প্লাজার একটি হোটেল থেকে এটা পেয়েছি। রেখে দিয়েছি কোনদিন কাজে লাগবে ভেবে। যদিও দুবছর আগের ডেট লেখা আছে।

বইটা অবিকল ম্যাচবক্সের মত। লাল–জল সিঙ্কের ওপর সোনালী হরফে লেখা ক্লাবের নাম, ফোন নম্বর। –এটা পরে ফেরৎ দেবো। ধন্যবাদ বলে, পকেট বই ও ম্যাচ ফোল্ডার পকেটে রাখি।

–কে এই পাপ আপনার ঘাড়ে চাপিয়েছে?

কারোর দরকার নেই জানার। বলে, বেরিয়ে আসি। লাউঞ্জে যেতে যেতে বই–এর পাতা ওল্টাই। পাঁচশ জন সভ্যের নামধাম লেখা। তার মধ্যে আমার কাছে চারশো সাতানব্বই জন অর্থহীন। বাকি তিনজন... মিসেস ব্রিজিৎ ক্রিডি, মিঃ জ্যাকুইস ফ্রিবি এবং মিস্ মর্গট ক্রিডি।

মাথার মধ্যে অসংখ্য ঝিঁঝির ডাক। তার মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকে ওঠে। মাল নিয়ে কুলি যাচ্ছিল। তাকে ডেকে বলি–ও ভাই, ফ্রাঙ্কলিন অ্যাভিনিউ কোথায় বলতে পারেন?

–ডান দিকে গিয়ে দ্বিতীয় রাস্তা ধরুন। তারপর বাঁদিকে প্রথম সিগন্যালের পাশের রাস্তা।

ধন্যবাদ জানিয়ে, নিজের গাড়ির দিকে এগোই।

ফ্রাঙ্কলিন অ্যাপার্টমেন্ট

০৪.

যাদের মাসিক রোজগার চার অঙ্কের ওপর, কেবল তাদের জন্য ফ্রাঙ্কলিন অ্যাপার্টমেন্ট। সমাজের ওপর তলার ধনকুবেরদের ত্রিশটির বেশি ফ্ল্যাট আছে এই ব্লকে। সিলভার রিথ ও রোলসরয়েসের মাঝ দিয়ে ছুটছে আমার গাড়ি। পার্কিং জোনে গাড়ি রেখে পা রাখি ভেতরে। রিভলভিং দরজা। ওক কাঠের লবি।

খানিক দূরে রিসেপশনের ডেস্কের পিছনে এক লম্বা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে বন্ধুত্বের হাসি ছড়িয়ে বলি–মিস্ ক্রিডি আছেন?

নেকটাই নাড়াচাড়া করতে করতে আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে প্রশ্ন কবে সে–আপনাকে কি ডেকেছে মিস ক্রিডি?

না। দয়া করে তাকে বলবেন, আমি তার বাবার সাথে এই মাত্র দেখা করে এসেছি। দু একটা কথা তার সাথে বলতে চাই। আমার নাম লিউ ব্রান্ডন।

নিখাদ সোনার ও মেগা রিস্টওয়াচে চোখ রেখে সে বলে তাকে ডাকার সময় পেরিয়ে গেছে।

–শুনুন মশাই, মিস ক্রিডিকে খবর দিন, তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে দিন।

লোকটার চোখে শঙ্কা। সে চেয়ে থাকে খানিক। তারপর কাউন্টারের পিছনের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

প্যাকেট খুলে ঠোঁটে সিগারেট রাখি। মিনিট দুই পরে, সে হাসি মুখে ফেরে। বলে তিনতলা, সাতনম্বর ফ্ল্যাট।

স্বয়ংক্রিয় এলিভেটর পৌঁছে দেয় আমাকে তিনতলায়। সাত নম্বর ফ্ল্যাটের কলিং বেলে হাত রাখি। ভেতর থেকে ভেসে আসে মোসার্টের সিম্ফনি। সৌম্য চেহারার মধ্য বয়স্কা রমণী দরজা খোলে। পরণে সিল্কের পোষাক ও সাদা অ্যাপ্রন।

মহিলার প্রশ্ন–মিস্টার ব্রান্ডন?

–হ্যাঁ। ছোট্ট হল পেরিয়ে যেতে যেতে আমি টুপি দিই মহিলার হেপাজতে। চমৎকার সুদৃশ্য হল। ডিম্বাকৃতি টেবিলে রুপোর পাত্রে, অর্কিড ফুটছে। কর্মচারীনী মহিলা দরজা খুলে মিঃ ব্রান্ডন বলে একধারে সরে দাঁড়ায়। আমি ঘরে ঢুকি।

মস্ত লাউঞ্জ। ঘর, আসবাব আর পর্দার রং সাদা। এমন কি, গদি আঁটা চেয়ারগুলোও সাদা চামড়ার। মেঝের কার্পেট ও মিস ক্রিডির পোষাক সাদা। বিরাট রেডিও গ্রামের পাশে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ আমার দিকে। স্লিম, বেশ লম্বা, ধূসর সোনালী চুল রেশম কোমল। চিরন্তনের বহতা ধারায় কি অপার্থিব সৌন্দর্য। ফুটন্ত ফুলের শোভা তার চোখে। উন্নত স্তন, দীঘল দুটি পা, নিতম্ব যেন তানপুরা। দুধেল শরীরটা ঢেকেছে সান্ধ্য গাউন। গলায় হীরে বানো মালাটি বোধহয় নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কিছু খসিয়ে মিঃ ক্রিডি উপহার দিয়েছিলেন মেয়ের একুশতম জন্মদিনে।

কনুই ঢাকা গ্লাভস ঢেকেছে দুই হাত। মনিবন্ধে হীরক খচিত প্ল্যাটিনাম ঘড়ি। গ্লাভসের ওপর ছোট্ট অনামিকায় রক্ত রুবির সোনার আংটি। তার শরীরের প্রতিটি ত্বক যেন ঘোষণা করে তিনি কোটিপতি ঘরের মেয়ে। এবার বুঝলাম, মিসেস ও মিস ক্রিডির দ্বন্দ্ব কোথায়।

আমি কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বললাম–অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত মিস্ ক্রিডি। বিষয়টা খুব জরুরী বলেই কষ্ট দিলাম।

অস্ফুট হাসি তার চোখে। সে হাসি না আন্তরিকতার না বন্ধুত্বের। শুধু সৌজন্যবোধ। তার বেশি নয়, কমও নয়।

–বাবার সঙ্গে কি কথা হয়েছে আপনার?

–না মানে, সত্যি বলতে কি, আপনার বাবার নাম না করলে আমার মনে হয়েছিল আপনি দেখা করবেন না। স্টার এনকোয়ারী এজেন্সির প্রধান আমি। আশা করি আমায় সাহায্য করতে আপনি রাজি হবেন।

তার মানে–আ–আপনি প্রাইভেট গোয়েন্দা? তার কুঞ্চিত। চিন্তার রেখা কপালে। তবু দু–চোখে সৌন্দর্যের কালো মেঘের খেলা।

–ঠিক ধরেছেন। অপ্রস্তুত হেসে বলি–আমি লড়ছি একটা কেস নিয়ে। মিস ক্রিডি আমায় আপনি সাহায্য করতে পারেন।

সাহায্য! আপনাকে? কি বলতে চাইছেন আপনি। কেন সাহায্য করব আমি।

–কোন কারণ নেই। তবু কিছু লোক কার্পণ্য করেন না অপরকে সাহায্য করতে।

বলিব্যাপারটা খুলে বললে আপনি উৎসাহিত হবেন। সামান্য ইতস্ততঃ করে একটা চেয়ারে বসেন তিনি–ঠিক আছে বলুন। ঐ চেয়ারে বসতে পারেন আপনি।

বিপরীত চেয়ারে বসে শুরু করি আমাদের অফিস সানফ্রান্সসিসকো থেকে আমার পার্টনার মিঃ সিপ্পি টেলিফোনে একটা কাজের নির্দেশ পেয়ে এখানে আসেন দিন পাঁচেক আগে। যিনি ফোন করেছিলেন, তিনি নাম জানাননি আমাদের অপারেটরকে। সে সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম না। কে ডেকে পাঠিয়েছেননা জানিয়েই সিপ্পি অফিস ছেড়ে আসেন। কিন্তু তার ব্লটিং পেপারে আপনার বাবার নাম লিখে রেখে এসেছেন। এরপর তিনি কেবল মারফত আমায় এখানে আসতে লেখেন। আমি এসে পৌঁছই সকালে। আগে থেকেই সিপ্পি হোটেলে অন্য রুম বুক করেছিলেন। এসে শুনি, তিনি বেরিয়ে গেছেন। কিছুক্ষণ পরে তাকে সনাক্ত করার জন্য পুলিশ আমায় নিয়ে যায়। সমুদ্রতীরে এক স্নানের কেবিনে তিনি খুন হয়েছেন।

–কেন? মিস ক্রিডির চোখ বিস্ফারিতও হা হা, সান্ধ্য কাগজে দেখেছি–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না–তিনিই আপনার পার্টনার?

–হ্যাঁ।

–আপনি বলছেন, তার ব্লটারে আমার বাবার নাম লিখে রেখেছেন। কেন লিখেছিলেন?

–জানি না, তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কিনা আপনার বাবা।

রক্তরুবি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মিস ক্রিডি বলেন বাবা ডাকবেন না। যদি তেমন দরকার হত, তিনি তার সেক্রেটারিকে ব্যবস্থা করতে বলতেন।

–এসবের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আর কয়েক মিনিটের জন্য আমাকে একটু বেরোতে হবে।

–আজ দুপুরে আপনার বাবার সাথে দেখা করেছিলাম। প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি ভাড়া করেছিলেন কিনা সিপ্পিকে। তিনি বলেছেন করেননি। এবং ক্ষেপে গিয়ে হার্জ নামক একজনকে ডেকে আমার ওপর নজর রাখতে বলেছেন।

কি মুশকিল, আমার সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক বুঝতে পারছি না। ক্ষমা করুন, আমাকে এবার উঠতে হয়...

আমি উঠে দাঁড়াই...সিপ্পির গতিবিধি অনুমান করার চেষ্টা করছি। মনে হচ্ছে, সিপ্পি মাসকেটিয়ার ক্লাবে গেছিলেন। কার সাথে গেছিলেন, সেটাই প্রশ্ন। আপনি কি মেম্বার ঐ ক্লাবের? আপনি যদি সেখানে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে আমি কিছু খোঁজখবর নিতে পারি! মানে তদন্তের জন্য...

মিস ক্রিডি এত অবাক যেন আমি চাঁদে পা দিতে চাইছি–অসম্ভব ব্যাপার। এধরনের ইচ্ছা না থাকলেও, ধরুন যদি আপনাকে আমি ক্লাবে নিয়েও যাই, কোনো মেম্বারই আপনার জিজ্ঞাসাবাদ করাটা পছন্দ করবেন না।

–আমি আপনার সঙ্গে তো যাবো। শুনেছি সেখানে দারুণ বড়লোকের ভিড়। যদি আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন আমার হয়ে।

–আ'ম সরি মিস্টার ব্রান্ডন। তা এক্কেবারেই অসম্ভব। এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনি চলে যান।

মিস ক্রিডি বেল বাজান। মধ্যবয়স্কা পরিচারিকা ঢুকতেই বলেন–অ্যাই টেসা, এখন মিস্টার ব্রান্ডন যাচ্ছেন।

পরিচারিকার হাত থেকে টুপি নিয়ে আমি ঘর ছেড়ে করিডোরে রাখি।

এলিভেটরে নামতে নামতে মনে হল, মর্গট জানে তার বাবা সিপ্পিকে কেন ভাড়া করেছিলেন। অর্থাৎ এটা পারিবারিক ব্যাপার। এ ব্যাপারে মিসেস ক্রিডির বয়ফ্রেন্ড জ্যাকুইস ফ্রিসবির সাথে কথা বলা দরকার।

এখন মাত্র এগারোটা দশ। হোটেলে এত তাড়াতাড়ি ফিরবো? গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণ বসে রইলাম চুপচাপ। তারপর সমুদ্রাভিমুখে গাড়ি ছোটালাম।

মিনিট দশেক লেগেছে সমুদ্রতীর পৌঁছতে। অগনিত নারী–পুরুষ নেমেছে সমুদ্রস্নানে। বালিয়াড়ি ভেঙে হাঁটছি তীরের দিকে। বিচ–এর গেট বন্ধ। তালা দেওয়া। যাক্ নিশ্চিন্ত। কেউ লক্ষ্য করবে না আমায়। দূরে দেখা যায় স্নানার্থিদের সারিবদ্ধ কেবিন। পাহারার জন্য র‍্যানকিন পুলিশ মোতয়েন করতে পারেন। সমুদ্রতীর ভারি নিঃসঙ্গ।

এই সেই অভিশপ্ত কেবিন, দরজা ঠেলোম, খুললো না, তালাবন্ধ সঙ্গে ফ্ল্যাসলাইট ছিল। জ্বালোম। পকেট থেকে সরু একটা স্টীলের গজ বের করলাম। কড়া ও তালার মধ্যে সেটা ঢুকিয়ে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল।

দরজার কাছে থামলাম। গনগনে আঁচ থেকে যেন তাপ ঝাপটা দিচ্ছে। ফ্ল্যাসলাইটের তীব্র গোল আলো, সারা ঘরে ধীরে ধীরে বোলালাম।

ঘরে দুটো আসবাব। একটি ডিভান, একটি টেবিল, যেখানে সিপ্পি মারা যায় সেই কোনে রক্তের কালো ছাপ মৃত্যুর আলপনা এঁকেছে। ভয় ভয় লাগে। হিম হয়ে আসে শরীর। আমার বিপরীতে দুটো দরজা। এঘর থেকে দুটো ঘরেই যাওয়া যায়। ওরই একটা ব্যবহার করেছিল সিপ্পি। এই মেয়েটার কথা ভাবতে অবাক লাগে। কোন বদ উদ্দেশ্যে কি সিপ্পিকে এখানে এনেছিল? মেয়েদের ফাঁদে পা দেবার ছেলে সিপ্পি নয়। সিপ্পির মৃত্যুতে ক্রিডির কি কোন হাত নেই?

হাত দিয়ে কপাল মুছি। ভাবতে থাকি মেয়েটাই খুনী নয়তো?

দরজা ভেজিয়ে ঢুকি। সামনের ড্রেসিং রুমের দরজা খুলে উঁকি দিই ভেতরে। কিছু না পেয়ে অগত্যা বেরিয়ে এলাম। ভাবছি, সময় নষ্ট শুধু শুধু। এবার দেখা যাক পাশের

ঘরটা। চকিতে অনুভব করি অন্ধকার কেবিনে একা নই আমি। স্নায়ুর মত দাঁড়িয়ে থাকি। কান পেতে রই। কেবল নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ। ফ্ল্যাসলাইটের বোতামে হাত লেগে নিভে যায়। আমাকে ঢেকে দেয় প্রগাঢ় অন্ধকার। কিছুক্ষণ কাটে। কোন সাড়াশব্দ নেই। ভাবি, আমায় বিভ্রান্ত করেছে আমার কল্পনা। তখনই ক্ষীণ শ্বাস ফেলার শব্দ কানে আসে। কে যেন খুব ধীরে ধীরে মুখ খুলে শাস ফেলছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে অন্য কোন শব্দ হলে ঐ শব্দে পেতাম না। ভাগ্যিস বন্দুক এনেছি সঙ্গে। দু-পা পিছিয়ে ফ্ল্যাসলাইট জ্বালি। মেঝেতে আলো ছড়ায় বৃত্তাকারে। আলো ঘুরিয়ে দেখি। নজরে কিছুই পড়ে না। তবু ঐ ক্ষীণ শব্দ আমায় তাড়া করে ফেরে। দ্বিতীয় পোষাক ছাড়ার ঘরের দরজায় মৃদু চাপ দিতে খুলে যায়। তুলে ধরি ফ্ল্যাসলাইট।

মেয়েটি বসে আছে মেঝেতে। দৃষ্টি আমার দিকে। পরণে হালকা নীল সাঁতার পোষাক। উজ্জ্বল হরিদ্রাভ ত্বক। চোখদুটি খোলা শূন্য দৃষ্টি। বা কাঁধ থেকে বয়ে গেছে রক্তের ধারা। চব্বিশ পঁচিশ-এর যেন নিখুঁত মডেল, কালো সুন্দর মুখ।

আলোর বৃত্তে অন্তিম শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে অপলক চেয়ে থাকল সে। আমি দাঁড়িয়ে আছি পাথরের মত। সারা শরীর হিম হয়ে গেছে। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে।

তারপর খুব ধীরে একপাশে কাৎ হয়ে পড়ল। নিস্পন্দ। স্থির।

আমি নড়তে পারছি না। ঠায় দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে রয়েছি। মেয়েটি ঢলে পড়ার মুহূর্তে ছুটে গেলাম। কিন্তু হায়! তখন দেরী হয়ে গেছে বড়।

মৃতার দিকে তাকাতে গিয়ে বরফ খোঁচানো ছুরিটা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলাম। হাতল প্লাস্টিকের। অর্থাৎ যেভাবে সিপ্পি খুন হয়েছিল সেভাবেই যুবতী খুন হয়েছে।

উঠে দাঁড়াই। মুখের ঘাম রুমালে শুষে নিই। ঘরে অসহ্য গরম, বড় ঘরে পা বাড়াই। বেরিয়ে আসতে চোখে পড়ে একটা দরজা। পাশের কেবিনের সাথে যুক্ত। পিছনের দিকে খিল দেওয়া। এই খিড়কি দিয়ে খুনী ঢোকে, বেরিয়ে গেছিল কি? হয়ত এখনো সেই খুনী পাশের ঘরে ঘাপটি মেরে বসে আছে আমার যাবার অপেক্ষায়। সঙ্গের বন্দুক সাহস জোগায়। দরজার হাতলে হাত রেখে টের পাই, দরজা বন্ধ, চাপ দিলেও খোলে না। খুনী চলে যাবার সময় কি দরজায় পিছন থেকে খিল দিয়ে গেছে কি? নাকি ঐ ঘরে খুনী আছে?

তখনই এক আওয়াজ। শিহরিত হই। সর্বনাশ! ওটা দূরাগত পুলিশের সাইরেন।

দ্রুত ফ্ল্যাসলাইট নেভাই। দরজার হাতলে নিজের হাতের ছাপ মুছে দিই রুমাল দিয়ে। দরজার বাইরে আসি একলাফে। ডান বামে তাকাই। চতুর্দিকে শূন্য তীরভূমি।

সাইরেনের শব্দ আরো তীব্র। কাছে আসছে ক্রমে। পাম ঝোঁপের দিকে যেতে গিয়েও ফিরে আসি। পুলিশের লোক আসছে কেবিনের দিকে। এখন ঐ ঝোপে লুকোতে গেলে ধরা পড়ে যাবো নির্ঘাৎ।

অগত্যা পিছনের বিস্তীর্ণ বালুকাবেলার দিকে ছুটতে থাকি আপ্রাণ। সাইরেনের ধ্বনি কানে আসে। তীরে বোধহয় ওরা এসে পড়ল। পিছনে না তাকিয়ে কম করে ওদের থেকে হাজার গজ দূরে চলে যেতে হবে।

বহুদূরে কেবিনগুলো যেন খেলাঘর। আমার দিকে পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে আছে এক পেট্রলম্যান। চাঁদের আলোয় বেশ স্পষ্ট। ঐ মৃতার কেবিনে দুটো পুলিশ ঢুকলো।

অবশেষে রাস্তায় এসে পড়ি। নিজের গাড়িতে উঠে দ্রুত স্টার্ট দিই।

হোটেলের পার্কিং লটে গাড়ি থামাই। ডাস্টার দিয়ে পোষাক ও শরীরের বালি ঝেড়ে ফেলি। তারপর গাড়ি রেখে হোটেলে ঢুকি।

রাতের হোটেল ক্লার্কের কাছ থেকে ঘরের চাবি নিয়ে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে যাই। তখনই ফোন বাজে। ফোন ধরে রাতের ক্লার্ক। এলিভেটরের খাঁচায় সবে পা রেখেছি, সে জানায়–আপনার ফোন।

–কে আবার ফোন করলো এখন? অবাক লাগে।

–হ্যালো, বুথে এসে ফোন ধরি।

—-মিস্টার ব্রান্ডন?

–হ্যাঁ।

মর্গট ক্রিডি বলছি মিষ্টি নারীকণ্ঠ রিরিন্ বাজে।

–ফোন করার জন্য ধন্যবাদ।

–মাসকেটিয়ার ক্লাব থেকে বলছি। ভিজিটর বই দেখলাম। মিস্টার সিপ্পির নাম নেই।

–হয়তো ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন।

–আমিও তাই ভাবছি। দারোয়ান বললো, কয়েকমাস যাবৎ লালচুলের কোন লোককে সে দেখেনি। সব মনে রাখে লোকটা।

–তাহলে তিনি যাননি বোধহয়।

–তিনি গিয়েছিলেন ভাবছেন কেন?

ওনার স্যুটকেসে একটা ম্যাচ ফোল্ডার পেয়েছি।

–কেউ ওনাকে হয়তো দিয়েছিল।

–দিয়েছিল নিশ্চয়ই কেউ।

–হ্যাঁ, সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ, মিস ক্রিডি, আমি খুব..ক্লিক শব্দটা লাইন কেটে যাবার জানান দেয়। বুথ থেকে বেরিয়ে এলিভেটরের বোতাম টিপি।

ঘরে এসে বিছানায় টুপি খুলে ছুঁড়ে দিই। জ্যাকের স্যুটকেস খুলে বসি। ম্যাচ ফোল্ডারটা, দেখি পঁচিশ পাতা ছেঁড়া হয়েছে। প্রত্যেক কাউন্টার পার্টে মাসকেটিয়ার ক্লাবের নাম

খোদিত। ভেতরের প্রত্যেক পাতার পেছনে একটা পটারীর বিজ্ঞাপন ছাপা, বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে এই রকম—-

মারকুসই হ্যান স্কুল অফ সিরামিক্স। দ্য ট্রেজার হাউস অফ ওরিজিন্যাল ডিজাইন।
দ্য চ্যাটিউ
অ্যারো পয়েন্ট
সেন্ট র্যাফাইল সিটি।

এরকম এক সামান্য পটারীর বিজ্ঞাপন কি করে স্থান পায় দারুণ রাশভারি ও প্রখ্যাত ধনী ক্লাবের ম্যাচ ফোল্ডারে? এদের পাত্তা দেয় কি করে এত বড় ক্লাব? নিশ্চয় কিছু রহস্য আছে এর মধ্যে।

ম্যাচ ফোল্ডারের একটা পাতা ছিঁড়ে পরীক্ষা করি। পিছনের দিকে কটি সংখ্যা ছাপা আছে–C45il36 : এবং ফোল্ডারের প্রত্যেক পাতার পেছনেই, সংখ্যাগুলো ক্রমানুসারে ছাপা আছে। যেমন শেষ পাতাটির পিছনে ছাপা C451160। ম্যাচ ফোল্ডারের ছেঁড়া প্রথম পাতাটি ফোল্ডারে ঢুকিয়ে আমার ম্যানিব্যাগে রেখে দিই। আপাততঃ ঘুমোনো যাক।

দরজায় হঠাৎ করাঘাত।

সমুদ্র কেবিনে কি হাতের ছাপ রেখে এসেছি? বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি।

দরজা খুলুন, আমরা জানি আপনি ভেতরে আছেন, ভারী পুরুষকণ্ঠ।

দ্রুত মানিব্যাগ থেকে ম্যাচ ফোল্ডার বার করে ঘরের কোণে মেঝের কার্পেটের তলায় রেখে দিই। ব্যাগ রেখে দরজা খুলি।

সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যান্ডি। ভারি গলায় বলেনক্যাপ্টেন ক্যাচেন আপনাকে চান।

বিছানা থেকে টুপি তুলে নিয়ে বলি–আমি যাচ্ছি, চলুন।

.

০৫.

ঘরে ছটা চেয়ার, ডেক্স, ফাইলপত্তর রাখার ক্যাবিনেট। ক্যাপটেন ক্যাচেন, লেফটেন্যান্ট র্যানকিন এবং একচল্লিশ বছরের শীর্ণ, লম্বা, রিমলেশ চশমা পরিহিত ভদ্রলোক। ক্যাপ্টেন জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখ থমথমে। সিগার ঠোঁটে, রক্ত জমাট।

র্যানকিন বসে আছেন উঁচু চেয়ারে। ভারিকি গলায় লম্বা ভদ্রলোক বলেন–এর হাতে হাতকড়া কেন ক্যাপ্টেন?

সহসা মনে হয়, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ক্যাপ্টেনের। ক্যাপ্টেন বলেন–একে গ্রেফতার করায় আপনার যদি আপত্তি থাকে আপনি কমিশনারের সাথে কথা বলতে পারেন।

এনাকে অ্যারেস্ট করা হল কেন?

ক্যান্ডির দিকে তাকান ক্যাচেন, বলেন–খুলে দিন হাতকড়া।

আমায় হাতকড়া খুলে দেন ক্যান্ডি।

বসুন মিস্টার ব্রান্ডন। খড়ের মত চুলের দীর্ঘ শীর্ণ ভদ্রলোক বলে–আমি হোল্ডিং। আসছি ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস থেকে। শুনলাম, আপনাকে দেখতে চেয়েছেন ক্যাপ্টেন, তাই আমিও দেখতে এলাম আপনাকে। হোল্ডিং চোখ থেকে রিমলেশ চশমা সরিয়ে নেন। কাঁচ. পরীক্ষা করে মুছে ফের পরেন, বলেনকর্তব্যের বাইরে ক্যাপ্টেন ক্যাচেন কিছু করতে পারেন না।

জানলা থেকে ঘরে আমার দিকে তাকান ক্যাপ্টেন। চোখে বন্য গরিলার উগ্রতা।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হোল্ডিং বলেন ক্যাপ্টেন প্রশ্নগুলো আপনি করবেন না আমি করব?

ক্যাচেন চুপ। আমার থেকে হোল্ডিং–এর দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বলেন–আপনিই করুন। আমি কমিশনারের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি। ইদানিং বড্ড বেশি বাধা আসছে আপনাদের অফিস থেকে।

ঘর ছেড়ে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন। সার্জেন্ট ক্যান্ডি জিজ্ঞাসা করেন–আপনার আমাকে প্রয়োজন নেই তো মিঃ হোল্ডিং।

–না, ঠিক আছে, আপনি আসতে পারেন। চলে গেলেন ক্যান্ডি।

হোল্ডিং আমার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন ক্যাপ্টেন ক্যাচেন এমাসের শেষের দিকে রিটায়ার করছেন। তার জায়গায় আসছেন লেফটেন্যান্ট র্যানকিন।

কনগ্রাচুলেশন, আমি বলি।

প্রত্যুত্তরে র‍্যানকিন অধৈর্যভাবে নড়েচড়ে বসেন। টাই ঠিক করেন। কোন জবাব দেন না।

হোল্ডিং জানান–এই রহস্য উদ্ধারের পুরো দায়িত্ব লেফটেন্যান্ট র‍্যানকিনের ওপর। আমি সমুদ্রতীরের জোড়া খুনের কথা বলছি।

এখন জানলাম এ কেসটা র‍্যানকিনের হাতে। সম্ভবতঃ আমাকে ক্যাপ্টেন ফাসাতে পারবেন না। অতএব সানন্দে আমি একটা বিবৃতি দিতে রাজি আছি।

এবার সহজভাব হোল্ডিং বলেন–ঐ কেবিনে ঢুকতে দেখা গেছে আপনাকেই?

তা বলতে পারবো না। তবে, ওখানে ঢুকে দেখেছি যুবতী মারা যাচ্ছেন।

উনি কি বলেছিলেন কিছু?

–না, তাকে দেখার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই উনি মারা যান।

–ওখানে কেন গিয়েছিলেন?

–কোন নির্দিষ্ট কারণে নয়। কোন কাজ ছিলনা হাতে। ভাবলাম অকুঃস্থলটা ফের দেখে আসি। জানি বিশ্বাসযোগ্য হলো না কথাটা। কিন্তু আমার পার্টনার ওখানে খুন হয়েছেন।

আজ সকালে যখন যাই তখন আপনাদের বহুলোক ছিল। আমি জায়গাটা শুধু আর একবার দেখতে গেছিলাম।

–কখন গেছিলেন?

সঠিক সময় এবং ওখানে যা যা দেখেছি সব বললাম। র্যানকিন তাকান হোল্ডিং–এর দিকে। তারপর হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে হাসি ফুটলো তার কঠোর শক্ত মুখে–আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আমিও আপনার জায়গায় হলে একই কাজ করতাম। তবে, আর ওরকম কাজ করবেন না। আপনি কত ভাগ্যবান ভেবে দেখুন। আপনাকে খুনের চার্জে ফেলা হয়নি। কারণ ডাক্তারের মতে মেয়েটিকে ছুরি মারা হয়েছে অন্ততঃ আপনি কেবিনে ঢোকার দু–ঘন্টা আগে। কি করে জানলেন ওখানে মহিলা আছেন?

–কেউ আপনাকে ঐ কেবিনে ঢুকিতে দেখে হেড কোয়ার্টারে খবর দেয়।

নিশ্চয়ই খুনীর পাত্তা পাওয়া যায় নি? মৃত মহিলাটি কে? হোল্ডিং ও র্যানকিন পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করেন। হোল্ডিং বলেন–সম্ভবতঃ সেই মহিলা যিনি সিপ্পিকে হোটেল থেকে ডেকে আনেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সকাল এগারোটা থেকে মহিলা কি করছিলেন বুঝতে পারছি না।

সনাক্ত করা গেছে মৃতাকে?

থেলমা কাজন নামে এক মহিলা নিরুদিষ্ট হয়ে সকালে কাজে গিয়েছে, এই বলে তার বাড়িউলি রিপোর্ট করেছেন। আমরা দ্বিতীয়বার থেলমাকে পরীক্ষা করতে যাচ্ছি। যার কাছে কাজ করতেন থেলমা, সেই ভদ্রলোকও উপস্থিত থাকবেন।

–তিনি কে?

তার নাম মারকুইস হ্যান–জানান র‍্যানকিন। মজার কথা তিনি অ্যারো পয়েন্টে স্কুল অফ সিরামিক্স নামে পটারীর ব্যবসা চালান। তার ঐ শোরুমে থেলমা কাজ করতেন।

র‍্যানকিন চলে যান।

অনেকক্ষণ বাদে হোল্ডিং বলেন ক্যাপ্টেনের সাথে আজ সকালে আপনার কি কথা হয়েছে? আপনি কি ক্যাচেনকে বলেছেন, সিপ্পিকে কাজের জন্য ক্রিডি ভাড়া করে ছিলেন?

–হ্যাঁ।

–তার কোন প্রমাণ আছে?

আমি সব বললাম। ক্রিডির নাম ব্লটারে লিখে রেখেছিল সিপ্পি তাও জানালাম। শুনে হোল্ডিং বলেন–অন্য কোন লোকও তো ক্রিডি সম্পর্কে খোঁজ নেবার জন্য সিপ্পিকে নিযুক্ত করতে পারে।

নির্বিকার ভঙ্গিতে শুনে যান হোল্ডিং। পাইপ থেকে ধোঁয়া ওড়ে। বলেন–এখন মনে হচ্ছে আমার, সিপ্পিকে লী ক্রিডি ভাড়া করেছিলেন। সিপ্পি খুন হতে ক্রিডি চাইছেন, সিপ্পিকে তার কাজে নিযুক্ত করার কথাটা চেপে যেতে। আচ্ছা সিপ্পির হত্যারহস্যভেদেই আপনার বেশি আগ্রহ তাইনা?

–অবশ্যই।

–তা কিভাবে সিপ্পি হত্যারহস্য ভেদ করবেন ভাবছেন? নিরাপত্তা ছাড়া বেশীদূর যেতে পারবেন না।

–জানি। যে অবস্থায় আছি, নিরাপত্তা ছাড়া চলবে না।

–সে ব্যবস্থা করা যাবে। যদিও এখনি তা কার্যকর করা যাচ্ছে না।

–আমার গলা থেকে ক্যাচেনের ফাস সরে গেলে হার্জকে ঝেড়ে ফেলতে পারি।

ক্যাচেনকে আটকানো যায়। কঠিন হার্জকে সামলানো। ওকে অত ফ্যালনা মনে করবেন না। ওঠা যাক তাহলে, দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমার শোবার সময় এখন।

–কিন্তু আমি কি তদন্তের স্বাধীনতা পাব।

–সেটা প্রশ্ন নয়। সিপ্পির মৃত্যুর পর আপনি নিজস্ব পদ্ধতিতে তদন্ত করবেন, ধর্তব্য সেটাই, যেহেতু দুজনেই আপনারা গোয়েন্দা ট্রেডের লোক। ঠিক আছে, আমার কার্ড রইল টেবিলে। আপনি আমার সীমাবদ্ধতা বুঝবেন না। উনি বলে যান–আগামী কয়েক

সপ্তাহের মধ্যে একটা নতুন মোড় নেবে প্রশাসন। বিরোধীপক্ষরা সুযোগ খুঁজছে এ শহরে ক্রিডির আধিপত্য খর্ব করার। সিপ্পির মৃত্যুর সাথে কোনভাবে যদি ক্রিডি জড়িত থাকেন, বিরোধীরা মস্ত সুযোগ পেয়ে যাবে। বর্তমান প্রশাসন যথেষ্ট জনপ্রিয় না হলেও বিস্তর শক্তিশালী। এখন তারা তীক্ষ্ণ তরবারির ওপর। দাঁড়িয়ে। যে কোন স্ক্যান্ডাল তাদের ফেলে দিতে পারে।

–ওকে। তদন্ত চালিয়ে যাব আমি। আপনাদের অসুবিধা দূর করার জন্যনয়। জাজ হ্যারিসনের ভোটের টিকিট পাবার জন্য নয়। আমার পার্টনার খুন হবার জন্য তদন্ত করবো। যা আমার ব্যবসার পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি আমার অংশীদার ছিলেন বলেই এর পেছনে আমার সেন্টিমেন্ট কাকু করছে। নইলে বেঁচে থাকাই বৃথা আমার। যদি আপনাদের স্বার্থান্বেষী লোকেরাআমার রহস্যভেদের কাহিনী জানতে চান, তাহলে আমার খরচা দাবী করব আমি।

চমকে ওঠেন হোল্ডিং–তাও ব্যবস্থা হবে। তবে তার আগে আমরা নিশ্চিন্ত হতে চাই, ক্রিডি এ কেসের সঙ্গে যুক্ত কিনা।

বুঝতে পাচ্ছি। ইতিমধ্যে কারোর থেকে কি কোন সাহায্য পেতে পারি?

–আপনার জন্য কি ব্যবস্থা করেছি র‍্যানকিন জানেন। সময় সময় তার বাড়িতে যোগাযোগ করলেই জানতে পারবেন, তিনি তদন্তের কাজে কদুর এগিয়েছেন।

–ঐ সম্পাদকের কি নাম?

রালফ ট্রয়। আপনি তাকে বিশ্বাস করতে পারেন। তাকে সত্য কাহিনী দিলে তিনি ছাপবেন।

তার আগে রহস্য ভেদ করতে হবে। দেখা যাক, কদুর যেতে পারি...তারপর দেখা যাবে।

হোল্ডিং হাত বাড়ান–গুডলাক্। সাবধানে থাকবেন।

জানি আমার দরকার ভাগ্যের, আমাকে সাবধান হতেই হবে।

হেড কোয়ার্টারের শেষপ্রান্তে লাশ কাটা ঘর। আমি ঐ ঘরে ঢুকতে র‍্যানকিন আমাকে দেখে রুক্ষস্বরে খিঁচিয়ে ওঠেন–কি চাই?

অদূরে উপবিষ্ট একজনকে দেখিয়ে বলি–ঐ লোকটা কি হ্যান?

–হ্যাঁ। ঝানু পটারী ব্যবসায়ী। ওনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। উনি কি বলেছেন জানেন? মৃতার বাহুতে র‍্যানকিনহাত রাখেন–কোন বয়ফ্রেন্ড ছিলনা থেলমার। ধার্মিকটাইপের যুবতী। পটারীদের কাজ করে গরীবদের সেবা করতেন। থেলমা অক্ষত যোনি, ডাক্তার বলেছেন, কুমারী।

–সিপ্পিকে শেষ অব্দি বয়ফ্রেন্ড বলেই কি মনে হয় না?

মর্গের আলো নিভিয়ে দেন র‍্যানকিনা–আপনি হোল্ডিং–এর কথায় নাচছেন? আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলতে থাকেন–লক্ষ্য রাখুন ওনাকে। গত চারবছর ধরে যে পজিসনে উনি আছেন, তাতে কারো না কারোর প্রভুত সাহায্য নিয়েছে। চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত লোকটি

সর্বদা নিজের দরকারে কাউকে না কাউকে ব্যবহার করেছেন। উনিই একমাত্র লোক, যিনি প্রশাসনে থেকে বিরোধী পক্ষের সাথে আঁতাত রাখেন। সুতরাং ওনাকে নজরে রাখবেন। র‍্যানকিন বেরিয়ে আসে মর্গ থেকে।

মাথায় ঘোরে র‍্যানকিনের কথাগুলো। ভাগ্যিস জানলাম, নৈলে বিশ্বাস করে বসেছিলাম হোল্ডিং-কে। তারপর মর্গ ও কোয়ার্টার ছেড়ে গাড়িতে চেপে বসলাম, গন্তব্য হোটেল।

নিজের রুমে গিয়ে চমকে উঠি। দমবন্ধ হবার জোগাড়। সিপ্পির ঘরের মত অবস্থা। আলমারির ড্রয়ার খোলা, ঝুলছে।

বিছানার গদি, তোষক ওলটপালট। ঘরময় সুটকেসের কাগজপত্র ছড়ানো ছিটানো। এমনকি সিপ্পির কাগজপত্রও লণ্ডভণ্ড। দ্রুত ছুটে যাই ঘরের কোণে। হ্যাঁ, কার্পেটের তলায় ম্যাচ ফোল্ডার ঠিক আছে। ফোল্ডার উল্টেপাল্টে দেখি। বোধহয় দুষ্কৃতির চোখ এড়িয়ে গেছে এটা। ফোল্ডারের পেছনে ছাপা নম্বরের স্থানটা ফাঁকা কেন?

উঠে দাঁড়াই। বুঝতে বাকী থাকে না, সিপ্পির ম্যাচ ফোল্ডার নিয়ে কেউ সুনিপুণভাবে নকল একটি ম্যাচ ফোল্ডার রেখে গেছে। আমাকে ধোঁকা দেবার জন্য। না-আসল ম্যাচ ফোল্ডার নয়।

লণ্ডভণ্ড বিছানায় গা এলিয়ে দিই।

.

০৬.

পরদিন বেলা সোয়া এগারোটা অবধি ঘুমোলাম। গত রাতে নাইট ক্লার্ককে যখন জানিয়েছি কেউ আমার অবর্তমানে আমার ঘর তছনছ করে গেছে, ক্লার্ক তৎক্ষণাৎ পুলিশকে ফোন করে জানায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে প্রাতঃরাশ এসে যায়। কফির পেয়ালায় চুমুক রাখতে ঝনঝন করে ফোন বাজে। র‍্যানকিনের স্বর–শুনলাম, কেউ গতরাতে হানা দিয়েছিল আপনার ঘরে।

হ্যাঁ

–কি রকম বুঝছেন?

–কি মাথায় আসছে না। কিছু পেলে জানাবো আপনাকে।

একটু থেমে র‍্যানকিন বলেনধর্মযাজক বলেছেন, কোন পুরুষ বন্ধু ছিল না মৃত থেলমার। ছেলেদের সঙ্গে মোটে মিশতেন না। থেলমা ছিলেন ধর্মপ্রাণ।

ফোন ছেড়ে দেন র‍্যানকিন।

কফি শেষ করে অফিসে ফোন করি এলাকে। কয়েক মিনিট ব্যবসায়িক কথাবার্তা হয়। দুএকদিন পর ফোন করব বলে লাইন কেটে দিই। অসহ্য গরম ঘরে। ইচ্ছে করছে সমুদ্রে বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে রৌদ্র মেখে আসি। কাল বিলম্ব না করে সাঁতারের পোষাক চাপিয়ে এলিভেটরে একতলায় নাবি।

ঘরের চাবি ডেক্লার্ক ব্রিওয়ারকে দিই।

ডে–ক্লার্ক বলে...আমি দুঃখিত মিস্টার ব্রান্ডন। আপনার নামে এত অভিযোগ..আপনি আসার পর চব্বিশ ঘণ্টায় চারবার পুলিশ এখানে হানা দিয়েছে।

জানি, বুঝেছি কেমন লাগছে আপনার। আজ রাতেই আমি চলে যাচ্ছি।

গাড়ি ছুটিয়ে চলে আসি সমুদ্রতীরে। এখন মধ্যাহ্ন। বারোটা বেজে গেছে। বিস্তর ভীড় সমুদ্রতীরে। গাড়ি রেখে এগিয়ে যাই স্নান–ঘাটের দিকে।

একদমে সমুদ্রতীর থেকে বহুদূরে চলে যাই। তারপর, ধীরে ধীরে সাঁতরে ফিরতে থাকি। তীরে উঠে চারদিকে চোখ বোলাই। নির্জনতা খুঁজি। যেখানে স্বচ্ছন্দে গা মুছতে পারি। তখনই চোখে পড়ে এক তরুণীকে। সাদা নীল ছাতার নীচে...দৃষ্টি আমার দিকে। সাঁতারের শ্বেতশুভ্র বিকিনী পরা। চোখে বড় রোদ চশমা লাগানো। রেশম কোমল চুল। অঙ্গসৌষ্ঠব মনে করিয়ে দেয় যেন ঐ মুখ দেখেছি কোথাও। হাতছানি দেন মর্গট ক্রিডি।

আমি তার কাছে পৌঁছতে বলেন–আপনি মিস্টার ব্রান্ডন তো?

যদি না হই, তাহলে নিশ্চয়ই কেউ আমরা চামড়া চুরি করে নিয়ে গেছে। আচ্ছা, ঐ বড় বড় রোদ–চশমার আড়ালে আপনি কি ঠিক মিস্ ক্রিডি?

খিল খিল করে হেসে উঠে সানগ্লাস খুলে তিনি বলেন বসছেন না কেন? ক্লান্ত, নাকি অন্য কোন কারণ আছে?

ধপ করে তার পাশে বসে পড়ি। বলি ক্লান্তি বা অন্য কিছু নয়। গতকাল সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, আশা করিনি।

ঘটনাচক্রে আমি তখন ক্লাবে ছিলাম। তাছাড়া আমার কৌতূহল ছিল। এ খুনের ঘটনা শুধু আশ্চর্যজনক নয়, নৃশংসতম, তাই না? যখন আপনি প্রশ্ন করলেন, আপনার পার্টনার ক্লাবে এসেছিলেন কিনা, তখনই জানতাম আসেননি, তবু পরীক্ষা করে একবার দেখলাম। ক্লাবের মেম্বার ছাড়া এখন ক্লাবে ঢোকা খুব মুশকিল।

আমি জিজ্ঞাসা করি–কাগজ পড়েছেন, আজ সকালের?

–মানে দ্বিতীয় খুনের কথা বলতে চাইছেন? মেয়েটি কে জানেন? ঐ মেয়েটিই কি আপনার বন্ধুর সাথে দেখা করেছিল, একসাথে কেবিনে ছিল?

–হ্যাঁ, ঐ যুবতীই।

ধরুন ঐ মেয়েটিই যদি সিপ্লিকে খুন করে থাকে। তারপর সে হয়তো কৃতকর্মের অনুতাপে আত্মহনন করে। মেয়েটি নাকি খুব ধর্মপ্রাণ ছিল, খবরের কাগজগুলো তাই বলছে।

–আপনার জায়গায় আমি থাকলে যুবতী কিভাবে মরেছে তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাতাম না। পুলিশের কাজ ওটা। অ্যারো পয়েন্টে, স্কুল অফ সিরামিক্সে কাজ করতে মেয়েটি। কখনো গেছেন সেখানে?

–অনেকবার গেছি, কেন? হ্যানের তৈরি বহু না আমার প্রিয়। দারুন কারুকাজ। এইতো, গত সপ্তাহে হ্যানের তৈরী এক বাচ্চা ছেলের স্ট্যাচু কিনে নিয়ে এলাম।

–এই যুবতীকে কখনো দেখেছেন?

–মনে নেই। অনেক মেয়েই তো ওখানে কাজ করে।

–আমার ধারণা দোকানটা ভ্রমণার্থীদের জন্য। নিঃসন্দেহে হ্যান একজন বড় শিল্পী। আমি একদিন দেখতে যাবো। সঙ্গে কি আপনি যেতে পারবেন?

— একটু চিন্তা করে মর্গট বলেন–আবার গেলে জানাবো আপনাকে। আপনি কি এখন অ্যাদেলফি হোটেলে আছেন?

মনে করিয়ে দিলেন। ভাল কথা, গতরাতে আমি ঐ হোটেলে আছি কি করে জানলেন?

মর্গট হাসে। সে হাসিতে নিটোল মসৃণ মুক্তোর মত ঝলমল করেদাঁত, যেন পাজরে ধাক্কা দেয়।

আমি বলি–পুলিশ একবার আমার ঘরে যাচ্ছে আসছে বলে ম্যানেজার ভীত হয়ে পড়েছে। আমায় আজ রাতের মধ্যে অন্যত্র জায়গা দেখতে হবে।

সহজ কাজ নয়। এখনই তো সিজন।

–হ্যাঁ, খুঁজে দেখি। হোটেল সংক্রান্ত ব্যাপারে জ্যাক অর্থাৎ সিপ্পি ছিল ওস্তাদ। কোন হোটেলের রুম কত সস্তা, খাবার দুর্দান্ত...এসব তার নখদর্পণে। এই হোটলেও ওই ব্যবস্থা করে দেন।

–আর কতদিন এখানে থাকবেন?

তদন্তের কিনারা যতদিন না হয়। সেটা এক সপ্তাহ বা একমাসও হতে পারে। কতদিন জানি না...।

অ্যারো বে'র সীমান্তে দু–তরের লীজে আমার একটা বাংলো আছে। আমি এখন সেখানে যাই না। এখনও একবছর বাকি লীজের মেয়াদ শেষ হতে। ইচ্ছে হলে, আপনি থাকতে পারেন। সেখানে আসবাবপত্রসহ সব সাজানো আছে। গত একমাস যাবৎ যাইনি। তার আগে দেখে এসেছি সব ঠিকঠাক আছে। লাইটের বিলটা শুধু আপনাকে মেটাতে হবে। বাকী সব ব্যবস্থা আছে। তেমন কাজ না থাকলে চলুন না আজ রাতে ডিনারের পর যাই। আমি রাত দশটা নাগাদ ফ্রি হব।

আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব মিস ক্রিডি, অপরিচিত বিদেশীর জন্য এমন অযাচিত উপকার–দেখুন, আপনাকে কোন রকম কষ্ট দিতে চাই না।

–না না, কষ্ট কিসের। ঘড়ির দিকে তাকাল মর্গট–এবার যেতে হবে, ড্যাডির সাথে লাঞ্চ আছে। তিনি দেরী পছন্দ করেন না। দশটায় মাসকেটিয়ার ক্লাবের বাইরে দেখা করবেন। তারপর একসাথে বাংলোয় চলে যাব।

–বেশ, ওখানে থাকবো আমি।

–তাহলে এখনকার মত বিদায়।

.

লাঞ্চ সেরে হোটলে ফিরলাম। স্যুটকেস গুছিয়ে নিলাম। বেল বাজিয়ে জোকে ডেকে সিপ্পির জিনিস তার স্ত্রীর কাছে পাঠাতে বললাম। তারপর সিপ্পির স্ত্রীকে সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখলাম, সেইসঙ্গে দুহাজার বাক্–এর চেক লিখে দিলাম। যদিও জানি, চেক ফেরৎ আসবে এবং শেষে মোটা অঙ্কের চেক দিতে হবে।

গ্রীভসের অফিসে এলাম। ডাস্টারে জুতো ঝাড়ছেন বললাম কোর্টে যাবেন নাকি?

–আমাকে যেতে বলা হয়েছে। ডাস্টার রেখে, টাই ঠিক করে টুপির জন্য হাত বাড়ালেন– আপনি লিফট দেবেন না বাস ধরবো।

–নিশ্চয়ই দেবো। চলুন।

কোর্টে পৌঁছই আমরা। করোনারের বিচার ব্যবস্থা বড় একঘেয়ে। তিনি আমার কাছে সাক্ষীসাবুদ চাইলেন। ব্রিওয়ারের দাপুটে বিবৃতি শুনলেন বহুদুরে চোখ রেখে নির্লিপ্ততায়। গ্রীভসকে ডাকলেন না। স্নানের কেবিনের দারোয়ানকে বাদ দিলেন। এক সময় র‍্যানকিন উঠে বললেন–পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে এ ঘটনার। সেজন্য একসপ্তাহ সময় মঞ্জুর করা

হোক। ভাল মানুষের মতো করোনার সময় মঞ্জুর করলেন। অতঃপর উঠে তার চেয়ারের পেছন দরজা দিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হলেন।

সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করে এসে আমি বসেছিলাম গ্রীভসের পাশে। ঝকঝকে চেহারার দুজনকে দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম–ওরা কারা?

উত্তর এল–সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল সমূহেরমধ্যে সবথেকে বড় ও তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন অ্যাটর্নিওরা।

–ওরা কি ক্রিডির ব্যবসা দেখেন?

–ক্রিডি ছাড়া এমন কোন বিখ্যাত বড় ব্যবসায়ী নেই যাদের কাজ ওরা করেননি।

কোর্টরুম থেকে বেরিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিই, পথে একস্থানে গাড়ি থামিয়ে পুলিশের কাছ থেকে জেনেনিই কুরিয়ার অফিসের ঠিকানা। তারপর নবলব্ধ ঠিকানায় এসে গাড়ি থামাই।

মিস্টার ট্রয় বললেন–বসুন মিস্টার ব্রান্ডন। আপনার কথা শুনেছি। হোল্ডিং বলেছেন আপনি আসতে পারেন।

আমি বলি–এখন বেশী কিছু বলতে পারছি না। শুধু পরিচয় করতে এলাম। হয়তো অল্প কদিনের মধ্যে জানাতে পারবো কিছু আপনাকে। বুঝছি, সত্য কাহিনী দিলে আপনি ছাপবেন।

ট্রয় বলেন–এ শহর অন্যায় আর নীতিহীনতায় ডুবে গেছে। কোন রকমে নাম কা ওয়াস্তে একটা প্রশাসন আছে। কাজকর্মের বালাই নেই।

–আজ জাজ হ্যারিসন নয়া সমাজ চান। —

ট্রয় কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বলল–অঙ্গীকার করেছেন করবেন, যদি নির্বাচনে যেতেন। কিন্তু জিতবেন না। আমি বলছি না এ শহরকে পরিচ্ছন্ন বা উন্নত করা যাবে না। করা যেতে পারে। ক্রিডি বা হ্যারিসন, যেই আসুন, কাজ করে যাবে সেই পুরোনো চক্র। এই হল সিস্টেম। তাছাড়া একজন মানুষ কিছুদূর পর্যন্ত সৎ থাকতে পারেন। সব মানুষকেই হয়তো কেনা যায় না, তবে পয়সা থাকলে হ্যারিসনকে কেনা যায়।

অনুমান করা যায় ঐ কুচক্রীদের নেতা ক্রিডি। ক্রিডি না হলে আর কে?

একমুখ ধোয়া ছেড়ে ট্রয় বলেন–ক্রিডির অর্থ নিয়ে যিনি ব্যবসা চালান এবং এ শহর যার অঙ্গুলি হেলনে চলে, তিনি মাসকেটিয়ার ক্লাবের মালিক কর্ডেজ। এখন ক্রিডি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে জাজ হ্যারিসন ক্ষমতায় এলেও কর্ডেজ তার নিজস্ব স্থানেই থাকবেন। কেউ যদি তার পায়ের তলার মাটি কেড়ে নেয়, তবেই শহর দুষ্টচক্র মুক্ত হবে। কিন্তু কেউ সে কাজে যোগ্য নয়,

–মাসকেটিয়ার ক্লাব নিশ্চয় কর্ডেজের একমাত্র আপত্তি নয়।

–না। ক্রিডির পয়সা লগ্নী করে তিনি পয়সা কামান। ক্যাসিনো একটি উদাহরণ। ক্রিডির পয়সায় যাবতীয় ব্যবসা কর্ডেজ দেখাশোনা করেন, বিনিময়ে পঁচিশ শতাংশ নেন। আমি

আপনাকে পরিষ্কার ছবি তুলে ধরলাম। ট্রয় বলে যান–হোল্ডিং বিষধর সাপ। তার স্বার্থে যতক্ষণ চলবেন ততক্ষণ বন্ধু। একপা এদিক–ওদিক হলেই ছোবল খাবেন। সুতরাং তাকে সাবধান।

মনিবন্ধে ঘড়ি দেখে ট্রয় বলেন–এবার যেতে হবে আমায়।

জিজ্ঞাসা করি–আগামীকাল হেল্পলের সাথে দেখা করবেন। কি, এই নামই তো বললেন?

–হ্যাঁ, ফ্র্যাঙ্ক হেপ্পল।

-মাসকেটিয়ার ক্লাবের কোন মেম্বারকে চেনেন?

আমি? হেসে ফেলে ট্রয়–বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

জায়গাটা দেখে আসতাম। –সে আশা ছাড়ুন। বোকামী করবেন না। মেম্বার ছাড়া, মেম্বার যদি কাউকে সাথে নিয়ে না যায়, তবে ওখানে ঢোকা অসম্ভব।

–আচ্ছা ক্রিডির বিরুদ্ধে নিরেট সাক্ষ্য প্রমান ছাড়া কি কিছু করার নেই?

–তার বিরুদ্ধে বেস কিছু করতে গেলে আমার ব্যবসা লাটে উঠবে।

–বেশ, এবার সাক্ষ্য প্রমাণ সহ আসবো।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল ট্রয়।

.

০৭.

মাসকেটিয়ার ক্লাবের অবস্থান হল, রিজা–প্লাজা হোটেলের শীর্ষতলায়। কিন্তু সেখানে ডোকা যায় কি করে?

হঠাৎ মনে পড়ল গ্রীভস একবার বলেছিলেন, তিনি রিজা প্লাজায় গোয়েন্দাগিরি করেছিলেন কিছুদিন। ফোনে যোগাযোগ করতেই তিনি আমায় থার্ড স্ট্রীটের বার এক্স–এ আসতে বলেন।

এবারের সব থেকে কোণার টেবিলে বসে বিয়ারের অর্ডার দিলাম। বেয়ারাকে দিয়ে সান্ধ্য খবরের কাগজ আনিয়ে পড়তে থাকি। প্রথম পাতায় বিরাট ছবিসহ খবর। ছবিতে র‍্যানকিনকে দেখা যাচ্ছে অকুস্থলে, শার্লক হোমসের দৃষ্টিতে দেখছেন। শেষ পাতায় থেলমার ছবি।

এমন সময় গ্রীভস এলেন। এসে টেবিলের অপরপ্রান্তে বসলেন, গেলাসে চুমুক দিয়ে বলেন–রিঞ্জা প্লাজা সর্বোচ্চ তলা জুড়ে মাসকেটিয়ার ক্লাব। প্রথমে আপনাকে হোটেলে ঢুকতে হবে। তারপর লবি, শেষ প্রান্তে লিফট। লিফট থেকে নেবে লবি ধরে খানিক গিয়ে খাঁচা। তারমধ্যে রিসেপশনিস্ট।

তিনি যদি আপনাকে চিনতে পারেন খাঁচা খুলে ভিজিটার্স বইতে সই করে ঢুকতে দেবেন। এবার ছাড়া পেলে আরেকটা লিফট আপনাকে পৌঁছে দেবে। লিফটে উঠে ওপরে কোথায় কি আছে জানি না। ওরা আপনাকে চিনবে না সুতরাং ঢুকতেও দেবে না। ওসব ভাবনা ছাড়ুন। মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন।

–ওপরে একটা রেষ্টুরেন্ট আছে না?

–এ শহরের শ্রেষ্ঠ রেষ্টুরেন্ট বোধহয়।

রেষ্টুরেন্ট ওপরে থাকায় নিশ্চয়ই একতলা থেকে বার বার মাছ মাংস অব্দি ওপরে যায়?

–হ্যাঁ যারা নিয়ে যায়, তাদের দেখেছি, তারা ডেলিভারি ম্যান।

ডেলিভারি ম্যানদের কাউকে চেনেন। আমায় ভেতরে ঢুকতে দেবার জন্য তাকে চাপ দেওয়া যেতে পারে? আমি শুধু ভেতরটা একবার দেখবো।

বীয়ার শেষ করে গ্রীভস বলেন–হ্যারি বেন্নামকে চিনতাম। এখনো কাজ করছেন কিনা জানি না। দারুন উৎসাহি আর কর্মঠ ছেলে। তবে আপনাকে তিনি সাহায্য না করলে আশ্চর্য হবেনা। আসছি এক মিনিট।

টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন গ্রীভস। টেলিফোন বুথ থেকে মিনিট পাঁচেক পরে এসে বললেন–এইমাত্র কথা বললাম। পঞ্চাশ বাসের জন্য হ্যারি তার বৌকে ছাড়তেও রাজী।

ব্যবসায়িক চুক্তি পঞ্চাশ বাস। ভেবে দেখুন, হ্যারি কিন্তু পঞ্চাশ বাসের বিনিময়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আপনাকে বৈচে দিতেও পারে।

–তাই যদি করে, ওরা মেরে ফেলবেনা আমাকে। বড় জোর গলা ধাক্কা দেবে। আপনি ওনাকে রাত সাতটায় সময় দিন।

গ্রীভস মাথা হেলান। হ্যারি এলিভেটরের কাছে থাকবেন।

–যদি ওখানে গিয়ে ঝামেলায় পড়ি কি করা উচিৎ একটু পরামর্শ দিন।

কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে হঠাৎ উঠেবললেন–ঘুরে আসছি। পালাবেন না। আধঘন্টার মধ্যে ফিরে এলেন, হাতে একটা মোড়ক। সেটা সামনে রেখে বললেন–নিন আর কুড়ি বা দিন। আমার পরিচিত এক মদ্য ব্যবসায়ী আছে। যে ওই ক্লাবে মদ সরবরাহ করতে চায়, কোন আশা যে নেই তা বোঝে না। এই বোতলে তার মদের নমুনা। আর এই যে, তার ব্যবসায়িক কার্ড।

কি আশ্চর্য, এটাই তো চাইছিলাম ধন্যবাদ; অসংখ্য ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ! বেশ, এবার উঠি।

উঠতে উঠতে গ্রীস মৃদুস্বরে বলেন–ইয়ে, আপনি জীবনবীমা করেছেন তো?

বললাম–এর চেয়ে কত সাংঘাতিক জায়গায় গুণ্ডাদের শায়েস্তা করেছি।

রিৎজা–প্লাজার নির্দিষ্ট এলিভেটরের সামনে এসে দাঁড়াই। ওপর থেকে নেবে আসে লিফট। কাঠের চৌখুপি থেকে ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে বেরিয়ে আসেন যিনি তিনিই গ্রীস বর্ণিত হ্যারি বেন্নাম। সাদা কোট, কালো ট্রাউজার, ঢুলুঢুলু চোখ। মোটা নাক, মুখশ্রী চমৎকার।

আমি হাসলাম–প্রাপ্য নিয়ে আমায় নিয়ে চলুন। পঁচিশ বা এগিয়ে দিলাম।

হ্যারির চোয়াল শক্ত হল–একি, গ্রীভস বলেছে পঞ্চাশে?

–গ্রীভস এও বলেছেন আপনাকে বিশ্বাস করা যায় না। এখন অর্ধেক, জায়গা দেখে ফেরার সময় বাকী অর্ধেক।

পঁচিশ বাক্স হিপ পকেটে চালান করে দিয়ে হ্যারি বলেন–পিছনের দরজা দিয়ে যান। তবে বিপদে পড়বেন কিন্তু।

–পঁচিশ বা কি এমনিই দিচ্ছি? ওখানে আর কে কে আছে এখন?

এখন কেউ নেই, আর দশ মিনিটের মধ্যে সব এসে পড়বে। বস্ তার অফিসে।

কর্ডেজ?

–মাথা নাড়ে হ্যারি।

আর ওয়াইন ওয়েটার?

–অফিসে।

–বেশ আপনি চলুন আগে, আমি আসছি পেছনে। কোন বিপদে পড়লে আমি ওয়াইন ওয়েটারের খোঁজ করবো। সঙ্গে স্যাম্পেল আর বিজনেস কার্ড আছে। হ্যারি এগিয়ে যান লবির দিকে। অল্প দূরত্ব রেখে আমি অনুসরণ করি। দরজা পেরিয়ে পা রাখি প্রকাণ্ড ককটেল লাউঞ্জে। দেখার মত জায়গা। এমন মনোরম বিশাল বার জীবনে প্রথম দেখলাম। দুই দরজার মাঝে ইংরেজি এস আকারে বার। তিনশো জন লোক একত্রে বসতে পারে। কালো কাঁচের মেঝে। ঘরের অর্ধেক অংশ ছাদ বিহীন। যেখানে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা গোনা যায় এখান থেকে দশমাইল পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। চোখে পড়ে সমুদ্র ও বালিয়াড়ি। পাম গাছের আড়ালে বেন্নামের সাথে মিলিত হই। তিনি জানান অফিসগুলো ঐ দিকে। বারের পেছনে দরজার দিকে অঙ্গুলি–সঙ্কেত করেন। রেষ্টুরেন্ট এদিকে। আপনি কি দেখতে চান?

–পুরো জায়গাটা। আচ্ছা, আপনি সবাইকে যে ম্যাচ ফোল্ডার দেন, সেরকম কিছু ম্যাচ ফোল্ডার আমাকে দিন না?

আমি বেন্নামের কাছ থেকে একটা ম্যাচ ফোল্ডার নিই। খুলে উল্টে পিছন দিকে দেখি না, কোন সংখ্যা ছাপা নেই।

এরকম আরো আছে?

–এগুলো তো ম্যাচ–ফোল্ডার, না?

জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

–আরেক রকম আছে, যেগুলো বস্ দেন। দেখুন মশাই, ওসব বাদ দিন। বেন্নামের মুখ ঘামে ভিজে ওঠে। আপনাকে এখানে কেউ দেখলে চাকরি যাবে আমার।

–অফিসগুলো দেখার সুযোগ হবে না?

–আসুন।

এমন সময় বারের পেছন দরজা দিয়ে ল্যাটিন চেহারার মোটা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তার সাদা কোর্টের বুকে এমব্রয়ডারী করা আঙুরের ছবি চিনিয়ে দেয় ইনি ওয়াইন ওয়েটার। লোকটার দৃষ্টি বেন্নামকে ঘুরে আমার দিকে স্থির হয়।

মাথা ঠিক রেখে বেন্নাম বলেন–ইনি মিঃ গোমেজ। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কোন কাজ হয় না এখানে। তারপর গোমেজের দিকে ফিরে বলেন–এই ভদ্রলোক আপনার সাথে কথা বলতে চান।

হাসি ছড়িয়ে বলি–আমাকে একটু সময় দিতে পারেন মিঃ গোমেজ, আমি হলাম ওক্লার। ক্যালিফোর্নিয়া ওয়াইন কোম্পানি থেকে আসছি। আমি ট্রেড কার্ড বের করে দিই। ভাবলেশহীন মুখ গোমেজের। কার্ড ফেরৎ দিয়ে বলেন–আপনাদের সাথে কোন কারবার আমার নেই।

–আমরা কাজ করতে চাই মিস্টার গোমেজে। আমাদের বহুমুখী ব্যবসা আছে যাতে আপনারা উৎসাহিত হবেন।

–উনি ভেতরে কি করে এলেন? গোমেজ বেন্নামের দিকে তাকান।

কি জানি, এখানেই ছিলাম আমি, দেখি, আপনাকে ভদ্রলোক এসে খুঁজছেন।

আমি বললাম, মালপত্রের লিফট ধরে এসেছি। ভুল করেছি?

গোমেজ বলেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া সেলসম্যানদের সাথে আমি দেখা করি না।

দুঃখিত মিঃ গোমেজ। কাউন্টারের ওপর ব্রান্ডির মোড়ক রেখে বলি, আগামীকাল আমায় ডেট দিতে পারেন? এই বস্তুটা ইতিমধ্যে চোখে দেখতে পারেন। আমরা কাল ব্যবসার কথা বলবো।

–আমরা এখনই ব্যবসার কথা বলব। পেছন থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

ঘুরে দেখি, কেতাদুরস্ত কালো মানুষটি কুড়ি ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। বুকের বোতামে সাদা ক্যামেলিয়া। ঈশ্বর দূতের মত মুখ, খাড়া নাক, ছোট চুল, চঞ্চল দৃষ্টি, রোগা, লম্বা, উনিই কি মিঃ কর্ডেজ?

–এটা? বার কাউন্টারের মোড়কের দিকে ইঙ্গিত করেন তিনি। দ্রুত মোড়ক খোলেন গোমেজ। টেবিলে ব্রান্ডির বোতল এমন ভাবে রাখেন যাতে কর্ডেজ লেবেলটা পড়তে

পারেন। লেবেলে চোখ বুলিয়ে কর্ডেজ বলেন–একমাস আগেই না বলেছি। আপনি না মানে জানেন না।

–দুঃখিত। আমি নতুন কাজ করছি তাই জানি না, আমার আগে এটা কেউ আপনাকে দেখিয়েছে।

–বেশ! এবার তো জানলেন। ক্লাব থেকে বেরিয়ে যান। চলে যান।

ও হ্যাঁ। আ'ম সরি। ভাব দেখছি যেন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়–বোতলটা যদি রেখে যাই, খুব ভাল ব্রান্ডি, যেকোন শর্তে আমরা এ মাল সরবরাহ করতে পারি।

–বেরিয়ে যান বলছি।

বার থেকে চলে আসি। কাঁচের মেঝেতে সবে পাঁচ–ছ পা ফেলেছি কি ফেলিনি, চোখের নিমেষে তিনজন গুণ্ডা শ্রেণীর লোক যাবার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। ওদের দুজনকে কস্মিনকালেও দেখিনি। লাতিন আমেরিকান মুখ, শক্ত, ভাবলেশহীন। তৃতীয়জনের ভাঙা চোয়ালের দিকে তাকিয়ে ধধ করে আমার হাঁটু কেঁপে ওঠে। এ আর কেউ নয়। সাক্ষাৎ যমদূত, হার্জ।

সাপের হিসহিস শব্দের মত হার্জের সরু ঠোঁট থেকে ছিটকে আসে–এই যে খোচ্চর, চিনতে পারছো?

আমি একপাশে সরে দাঁড়াই যাতে হার্জ ও কর্ডেজকে একসঙ্গে দেখা যায়। কর্ডেজ অবাক হয়ে বলে–কি ব্যাপার?

হার্জ বলে, ছুঁচোর নাম ব্রান্ডন। ব্যাটা টিকটিকি। সিপ্পির সহকারী।

আমার দিকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন কর্ডেজ। কাধ ঝাঁকিয়ে বারের দিকে চলে যেতে যেতে ছুঁড়ে দিয়ে যান কথাটা।

এখান থেকে বের করে দাও ওকে।

–আলবাৎ। হার্জ বললো–এই ছেলেরা সরো, জায়গা দাও, খোকাকে দেখি একটু।

ভয়ঙ্কর হাসি নিয়ে হার্জ বাকী দুই গুণ্ডাদের সরিয়ে কাঁচের মেঝেতে পা ফেলে আমার দিকে এগিয়ে এল। চকিতে পয়েন্ট থার্টি এইট রিভলভার বের করে চক্রাকারে ঘুরিয়ে হার্জের বুকে তাক করি–থামুন। আমাকে রাগালে ভাঙচুর হবে।

হার্জ এগিয়ে আসে কয়েক পা। দরজার হাতলে হাত রাখে। চোখ আমার দিকে।

দুই তাগরাই গুণ্ডা স্থির। ওরা পেশাদার গুণ্ডা। জানে, আমাকে ঘিরে ধরলে গুলি খাবার সম্ভাবনা আছে।

কর্ডেজ ফিরে আসেন। বলেন–আপনাকে চলে যেতে বলেছি। যান চলে যান।

আমি বলি–বাঁদরটাকে আমার পথ থেকে সরে যেতে বলুন, চলে যাচ্ছি।

–ঠিক তখনই ঝপ করে আলো নিভে যায়।

কাজটা বোধহয় হার্জের। দুমদাম কটা দ্রুত পদশব্দ। কমলা রঙের তীক্ষ্ণ আলো ছুটে গেল। ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল আয়না। কয়েকটি শরীর ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। এলোমেলো অনেকগুলো হাত আমার গলা, হাত, কোমর জড়িয়ে ধরেছে। আমি বন্দুকের ট্রিগারে চাপ দিতেই মাথার কাছে ধাতব কিছু মেঝেয় পড়ার শব্দ। একটা বুট আমার পাশে সজোরে পড়লো। বুঝলাম লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আন্দাজে মুখ লক্ষ্য করে ঘুষি চালালাম কষে। কাঁচের মেঝেতে দেহ আছড়ে পড়ার শব্দ। সেই সঙ্গে আঁক করে ভয়ার্ত আর্তস্বর। এমন সময় কে যেন আমার চোয়ালে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি হানলো। বেসামাল হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। মাথা ভো ভো করছে। তখনই আলো জ্বলে উঠল।

হার্জ ও দুই গুণ্ডার মধ্যে আমি পড়ে আছি। উফ চোয়ালটা বুঝি ভেঙেই গেছে। যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে। আমার বন্দুক কেড়ে নিল এক গুণ্ডা।

কর্ডেজের গম্ভীর গলা–ওকে নিয়ে গিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলল। যেন এমুখো আর না হয়

কর্ডেজ চলে যাচ্ছেন, তার জুতোর শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল। আমার বন্দুক হার্জের হাতে মুখে শয়তানের উল্লাস, পাকা বন্দুকবাজের মত বন্দুক নাচাতে নাচাতে হঠাৎ বন্দুক স্থির হয় আঙ্গুল ছুঁলো ট্রিগার। জানি পেশাদার বন্দুকবাজরা শত্রর কটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছাড়া সর্বত্র গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেয়। এবার নাও, কমাস হাসপাতালের বিছানায় খাবি খাও। মরবে না, যন্ত্রণা পাবে।

নম্র কণ্ঠে বলি–আমায় যেতে দিন আর কোনো গণ্ডগোল করবো না, শুধু এখান থেকে চলে যেতে দিন।

–তুমি যাবে চাঁদু। হার্জের মুখে নৃশংসতম হাসি–আমার রাস্তায় যাবে।

উঠে দাঁড়াই। আচমকা আমার মাথায় বন্দুকের বাঁটের আঘাত করে হার্জ। সরে যাই তৎক্ষণাৎ। পাশ দিয়ে বাতাস কেটে আঘাতটা কাঁধে এসে পড়ে। ফলে কাছাকাছি চলে আসি আমরা। মুহূর্তে হার্জের কোর্টের দুকোণা ধরে শূন্যে তুলে, মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিই। বারের কোণায় তার মাথা ঠুকে কাঁচের মেঝেতে আছড়ে পড়ে। উপুড় হয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে হার্জ।

দ্বিতীয় গুণ্ডার দিকে ধেয়ে যেতে প্রথম গুণ্ডা সরে যায়। লোকটা প্রস্তুত ছিল না। তার চোয়াতে এসে পড়ে আমার সর্বশক্তি নিয়োজিত দুর্দান্ত ঘুষি। ধুপকরে পড়ে, গড়িয়ে গেল সে। স্বচ্ছ কাঁচের মেঝেতে পিছলে দেওয়ালে গিয়ে দুম করে মাথা ঠুকে গেল। আওয়াজটা ভারী, বোধহয় ফাটলে মাথাটা।

অমনি তৃতীয় গুণ্ডাটা ছুটে এল মত্ত হাতির মত। কিন্তু তার চোখে ভয়। তার ডান হাতের নিচে মাথা নুইয়ে পাজরে মারলাম মোক্ষম ঘুষি। টাল খেয়ে সে পিছু হটলো। খপ করে তার দুই ঠ্যাং ধরে হিড়হিড় করে টেনে শূন্যে এক পাক ঘুরিয়ে দিলাম আছাড়। মাথাটা মেঝেতে সশব্দে আছড়ে পড়লো। মত্ত শরীরটা সামান্য কেঁপে ওঠে, অস্ফুট আর্তনাদ করে নিথর হয়ে গেল

হার্জের দিকে তাকালাম। বারের কোণে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মুখটা কাৎ হয়ে আছে। দৃষ্টি শূন্য, স্থির।

এক্ষুনি পালাতে হবে নয় তো এখানে কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে সব দেখে যেতে হবে। ভবিষ্যতে আর এখানে আসার সম্ভাবনা নেই। তার চেয়ে লুকিয়ে থেকে সব দেখে নিই। কিন্তু লুকোনো যায় কোথায়? টেরেসের দিকে হেঁটে যাই। ডানদিকে সারিবদ্ধ আলোর বিন্দু জানালায়। অনুমান যদি ভুল না হয়, ঐগুলোই মাসকেটিয়ার ক্লাবের অফিসঘর। টেরেসের ছাদ টপকালে ঢালু কাঠের পাটাতন নেমে গেছে ঐ জানালাগুলির মাথায়। চেয়ে দেখি, গাঢ়তর অন্ধকারে পাটাতন দেখা যাচ্ছে না। ওখানে নামতে হলে আগে টালির ছাদে নামতে হবে। আমি লাফিয়ে টেরেসের ছাদে উঠে পড়ি। প্রথমে কিছুটা সমান্তরাল, তারপর গড়ানে ঢালু টালি নেমে গেছে সটান নিচে। আমি সন্তর্পণে নিচে নামতে থাকি।

ধীরে উঠে দাঁড়াই, আরো নিচে নামতে হবে। ওঠার চেয়ে নামা শক্ত। পা ফস্কালেই তিনশো ফুট নিচে পড়ে মৃত্যু অবধারিত। টালির মধ্যে গোড়ালি গেঁথে শব্দহীন ভাবে সতর্কে পা ফেলে নামতে থাকি। ঢালু টালির শেষ প্রান্তে দু-হাত ধরে শরীর ঝুলিয়ে দিই। তারপর পা তুলে শরীর তুলে দিই।

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে অফিস ঘরের টেবিল, দামী পোষাকের সুদৃশ্য রমনী। আমি মিশে আছি অন্ধকারে। টেরেসের শেষপ্রান্তে কেউ না এলে আমায় দেখতে পাবে না। এক চিলতে পরিত্যক্ত লবি। জানালার পেছনে অবিকল বেড়ালের মত লাফ দিই। অল্প হাত পিছলে যায়। শরীর টাল খেয়ে পা হড়কে যায়। কোনরকমে বাঁ হাতে টালির কোণা

চেপে ধরি। কিসে যেন পা লেগে খুট করে শব্দ ওঠে। দুপা বেঁকিয়ে দিই লাফ। অফিস জানলার পেছনে পড়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

এটাও গড়ানে টালি–আরো নিচে নেবে গেছে। তবু সুবিধা এই, এখান থেকে অফিসগুলো স্পষ্ট দেখতে পাব। প্রথম দুটো জানলার ভেতরে তাকাই। লোকজন নেই। টেবিল, টাইপরাইটার ফাইলিং ক্যাবিনেট সব ঠিকঠাক সাজানোনা। প্রথম শ্রেণীর অফিসের মত। তৃতীয় ঘরটি বেশ লম্বা। ঘাড় উঁচু চেয়ারে মস্ত কাঁচ ঢাকা টেবিলের সামনে বসেছেন কর্ডেজ। ঠোঁটের দীর্ঘ পাইপে ব্রাউন রঙের সিগারেট। বড় একটা লেজারের সংখ্যাগুলোয় পেন্সিলে দাগ দিচ্ছেন। ঘরে নীল উজ্জ্বল আলো। জানলা থেকে যে আলোর রেখা এসে পড়েছে তা থেকে নিজেকে সরিয়ে চুপিসাড়ে দেখতে থাকি।

দশ মিনিট কেটে গেল। ভাবছি মিছি মিছি সময় নষ্ট। তখনই টোকা পড়লো দরজায়।

মুখ তোলেন কর্ডেজ–ভেতরে আসুন। বলে ফের কাজে মন দিলেন।

দরজা খুললো, মোটা লোকটা ঢুকলো। ঝকঝকে পোক। বোতামে লাল কারনেশন। ঢুকে লোকটা দাঁড়িয়ে রইল।

যোগ শেষ করে মুখ তোলেন কর্ডেজ। নির্লিপ্ত আন্তরিকতায় বলেন–দেখুন, আপনার কাছে পয়সা যদি না থাকে চলে যান। আপনার কাছ থেকে যা পেয়েছি, তা উশুল করে দিয়েছি।

–পয়সা এনেছি। লোকটা টাই ঠিক করে, পকেট থেকে একতাড়া ডলার টেবিলে রাখে–এই নিন, হাজার ডলার, এবার দুটো চাই। ভুল মাল দেবেন না।

কর্ডেজ ডলারগুলো ঢুকিয়ে রাখেন। উঠে আলমারি খুলে কি নিয়ে আসেন। টেবিলের ওপর ম্যাচ ফোল্ডার এগিয়ে দেন লোকটার দিকে।

লোকটা ফোল্ডারের পাতাগুলো পরীক্ষা করে পকেটে চালান করে দেয়। তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে প্রস্থান করে। ফের–লেজার খাতা খুলে বসেন কর্ডেজ।

দীর্ঘ চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আরো দুজনকে প্রবেশ, বিল প্রদান ও ম্যাচ ফোল্ডার নিয়ে প্রস্থান করতে দেখা যায়। তাদের একজন হোঁৎকা বয়স্ক এবং অন্যজন কলেজ পড়ুয়ার মত ছোকরা।

মনে পড়ে মর্গটের সাথে দেখা করার কথা। ঢালু চাতাল বেয়ে আরো নিচে নামতে থাকি। আরে কি এটা? মনে হচ্ছে হোটেলের বেডরুমের ব্যালকনি। জানালায় আলো নেই কোন। অর্থাৎ নিরাপদ। এ পথে বেডরুমে ঢুকে তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে যাব। এরপর লিফটে হোটেল ছেড়ে বেরোতে দেরী হয় না।

.

০৮.

হোটেলের রিভলভিং দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন মর্গট। উজ্জ্বল আলোর নিচে যেন সবুজ রাতপরী।

–হ্যালো। দারুণ লাগছে আপনাকে।

গলাবন্ধ সবুজ পোষাক দ্বিতীয় চামড়ার মত তার শরীর ঢেকেছে। মর্গট হাসেন–আপনার জন্যেই পরেছি। ভাল লেগেছে? জেনে খুশী হলাম।

সাথে গাড়ি আছে?

না। আপনাকে বাংলো দেখাবো, আপনি আমাকে পৌঁছে দেবেন না?

নিশ্চয়ই দেবো।

দরজা খুলে আমার গাড়িতে ওঠেন মর্গট। গাড়ি ছোটাই। মাঝে পথ নির্দেশ দেন তিনি, আমি চালাতে থাকি।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙিদারুণ জায়গা মাসকেটিয়ার্স ক্লাব, আপনি যান কখনো–সখনো?

–ঐ একটা জায়গা ট্যুরিস্টরা দখল করতে পারেনি। হ্যাঁ আমি গেছি অনেকবার। ক্লাবের অর্ধাংশের মালিক আমার ড্যাডি বলে, আমায় কোন বিল মেটাতে হয়না।

ঘণ্টায় চল্লিশ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলেছি।

মর্গট বলেন–বললে বিশ্বাস করবেন না টাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠি মাঝে মাঝে।

–আমিও। দেখুন, টাকার জন্য মরিয়া হওয়া আপনাকে মানায় না। মডেল হিসেবে নাচলে আপনার একটা ভবিষ্যৎ আছে। সেকথা কোনদিন ভেবেছেন?

–ড্যাড করতে দেবেন না তার মর্যাদাহানির ভয়ে। তিনি বলে দিলে কেউ কাজে নেবে না আমায়।

–পালাতে হবে আপনাকে। নিউইয়র্ক আপনাকে সাদরে গ্রহণ করবে।

–আপনি কি মনে করেন আমি পারব? বাঁ–দিকের রাস্তা ধরুন। অন্ধকারভেদী গাড়ির হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট হয় সমুদ্রাভিমুখী বালুকাময় এবড়ো–খেবড়ো রাস্তা। স্পীড কমিয়ে আনি।

ও শুধু কথার কথা, বলা সহজ।

লেডিজ ব্যাগ থেকে সিগারেট নিয়ে ধরান মর্গট। ধোঁয়া ছেড়ে বলেন–আপনার একা থাকতে ভালো লাগে না?

মনে পড়ে হার্জও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কথা। মনের ভাব চেপে বলি–কারণ থাকলে।

আরো আধ মাইল গাড়ি ছুটলো। দু–পাশে অন্ধকার চিরে হেডলাইটের আলো। জ্যোৎস্নায় ছায়া ছায়া পামগাছ ও বালিয়াড়ি। বহুক্ষণ দুজনেই নীরব। হঠাৎ মর্গট বলেন–এসে গেছি।

গাড়ি থামে। মর্গট আমার কাছ থেকে ফ্লাস লাইট নিয়ে যান। যেন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাগ হাতড়ে চাবি বের করেন।

মাইলব্যাপী জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বালিয়াড়ি। পাইন গাছেরশ্যামলিয়া আর অনন্ত সমুদ্র। দূরে খাড়াই পাহাড়ের ওপর বাড়ির মাথায় সমুদ্রমুখী তীব্র আলো দেখে বলি–ও আলো কিসের?

–ওটাই অ্যারো পয়েন্ট।

–ঐ আলো কি হ্যানসের প্লেস থেকে আসছে?

–হ্যাঁ।

তালা খুললো। আলো জ্বাললো, দেখা গেল দুর্দান্ত মহার্ঘ আসবাবে সাজানো ঘর। দুরে, এককোণে ককটেল বার। একটা টিভি কাম রেডিওগ্রাম কম্বাইন্ড। অনেকগুলো আরামদায়ক দামী চেয়ার। নীল সাদা মোজাইক মেঝে। দেওয়ালে তিনফুট দীর্ঘ জানালার ধারের ডিভান। বাঃ চমৎকার, সত্যি আমায় থাকতে দেবেন এখানে।

দরজা পথে মর্গট। চোখে লাস্যময় মদির হাসি ছড়িয়ে বলেন–পছন্দ।

ঐ হাসি রক্তে হিন্দোল তোলে। –অপূর্ব। বারের দিকে তাকাই। সব ধরনের মদ মজুদ।

–ঐ বোতলগুলো আপনার বাবার না আপনার?

–বাবার, বাড়ি থেকে কিছু কিছু করে এনেছি।

মর্গট বারের পেছনে ফ্রিজ খুলে এক বোতল হিমশীতল স্যাম্পেইন নিয়ে আসেন। –সেলিব্রেট করা যাক। এই যে, আপনি খুলুন, আমি গ্লাস আনছি। আমি বোতলের ছিপি খুলি। মর্গট লাউঞ্জ থেকে একটা ট্রেতে দুটো গ্লাস আনেন। গ্লাসে মদ ঢেলে দিই। গ্লাসে গ্লাস ঠেকাই–চিয়ার্স। ঠোঁটে তুলি। জিজ্ঞাসা করি–আমরা, কি সেলিব্রেট করছি?

–আমাদের মিলন। তার খোলা চোখে খেলা করে কামনা।

–আপনিই আমার জীবনে প্রথম, যিনি পরোয়া করেন না আমি গরীব না বড়লোক।

দাঁড়ান দাঁড়ান, কি করে ভাবলেন একথা?

ঠোঁট থেকে নিঃশেষিত গ্লাস নামিয়ে বললেন–আমি বলছি। এবার উঠুন, বাড়িটা ঘুরে দেখুন, কেমন লাগে। আমি খালি গ্লাস নামাই–কোথা থেকে শুরু করবো?

বাঁ–দিকে সোজা গেলে শোবার ঘর।

পরস্পরের দিকে অপলক তাকাই। বুকের মাঝে দমকা বতাস। দুজনেরই ভাবনা বুঝি একই কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মিশেছে। চমৎকার বেডরুম। ডাবল বেড।

জানালার ধারে ডিভানে শুয়ে আছেন মর্গট। দুটো কুশনের ওপর মাথা। দৃষ্টি প্রসারিত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সমুদ্রে। আমার দিকে না ফিরেই প্রশ্ন করে, পছন্দ হয়েছে?

খুউব। আমাকে এখানে রাখতে আপনি রাজী তো?

–হুম। আমিতে এটা ব্যবহার করছি না।

–খুনের তদন্ত কদ্দূর এগোলো?

–বিশেষ কিছু না। তবে এ মুহূর্তে, যখন আমার মধ্যে কিসব ঘটছে তখন কাজ নিয়ে মাথা ঘামাবো তা আশা করবেন না।

–কি হচ্ছে আপনার?

–এই-ই নির্জন বাংলো আর রাতপরীর মতো আপনি।

–তাহলে বলুন খুব বিরক্ত করছি আপনাকে!

করতে পারেন। হ্যাঁ আপনিই পারেন।

আমার দিকে তাকান সুন্দরী–কি হবে করলে?

একটুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর তার দীঘল পা মেঝেতে রেখে বলেন–সাঁতার কাটতে যাবেন?

চলুন।

আমি উঠে দাঁড়াই। গাড়ি থেকে ব্যাগটা নিতে হবে। ব্যাগ নিয়ে ঘরে আসি। বেডরুমে ব্যাগ রাখতে গিয়ে দেখি, পূর্ণ দৈর্ঘ্যের দেওয়াল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মর্গট। ধীরে ধীরে পোক খুলছেন। উন্মুক্ত হচ্ছে নগ্নদেহ। যেন নগ্ন শ্বেতপরী। দু-হাত মাথায় তুলে কাঁধ থেকে চুল সরাচ্ছেন। দৃষ্টি দর্পনে।

ব্যাগ রেখে, ফিসফিস করে বলি-ওটা তোমায় করতে হবে না, আমি করে দিচ্ছি।

ঘুরে দাঁড়ান মর্গট। ধীরে। চোখে কামনার আমন্ত্রণ। ভঙ্গিতে অহংকার তুলে বলেন-তোমার কি মনে হয়, আমি সুন্দর?

তার চেয়েও বেশী।

ধৈর্যের শেষ সীমায় চলে গেছি। যা ঘটতে চলেছে, মৃদু চেষ্টা করি তাকে থামাতে।

নিজের অপরাধবোধে বলে উঠি-আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত।

মাথা নাড়েন মর্গটও কথা বোলো না। আমি যা করি তার জন্য দুঃখিত হই না।

তখনও তার নরম দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ। ধীরে পা ফেলে আমার দিকে এগোতে যাবেন।

আঁধরে মর্গটের কথা ভাসে-একটা সিগারেট দাও। পাশের টেবিল থেকে প্যাকেট খুলে সগারেট দিই। লাইটার জ্বালি। সেই নরম আলোয় দেখি রাতপরীকে। বালিশে শায়িত সোনালী, মাথা। আমার দিকে তাকাতে চোখে চোখ পড়ে। হাসি ছড়ায়, লাইটার নেভাই।

অন্ধকারে মর্গটের সিগারের লাল আগুনের ছটা। অন্ধকারের নারী বলেন–কি ভাবছো আমার সম্পর্কে? ক্ষমা চাইছি না। আমি খুব স্বাধীন ও সহজলভ্যানই। কিন্তু যখন এমনটি ঘটে, তখন সেটা অবশ্যম্ভাবী। তোমাকে প্রথম যখন দেখি, কি রকম এক অদ্ভুত অনুভব পেয়ে বসে। যে রকম বহুকাল অনুভব করিনি। আর এ হল তার পরিণতি। তুমি বিশ্বাস না করলেও এ খুব সত্য। এই ইচ্ছে–সুখের পাগলামিতে আমি খু–উ–ব খুশি। নির্লজ্জ ভাবে খুশি। হাত বাড়িয়ে আমার হাত খুঁজে নেন মর্গট...তোমাকে যেমন ভেবেছিলাম, তার চেয়েও তুমি সুন্দর। আমার স্বপ্নের প্রেমিককেও হার মানিয়েছ তুমি।

ঘটনার আকস্মিকতায় তখন আমি বিহ্বল। বিমূঢ়। রমনীর প্রতিটি শব্দ রোমাঞ্চিত করে। .তবু মনে হয় যেন বড় অক্লেশে পেয়ে গেলাম। যেখানে আমার পা ফেলার কথা নয়, সেই নিষিদ্ধ এলাকায়, না, আমার পা টলেনি। দু–হাতে ভর দিয়ে মর্গটের শরীরের ওপর শরীর তুলে ঠোঁটে দিই আশ্লেষী চুম্বন।

একসময় তিনি উঠে পড়েন। ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে আমি অনুসরণ করি। দেখি, খোলা দরজার সামনে রাত্রির সমুদ্রের বালিয়াড়ির দিকে নির্নিমেষ চেয়ে আছেন। চাঁদের আলোয় যেন ছবি। প্রকৃতির হাতে গড়া মূর্তি।

আমরা বারান্দায় আসি। চাঁদের আলোয় ঘড়ি দেখি। দুটো বেজে গেছে।

মর্গট আগে, আমি পরে সমুদ্রে নামি। দুশো গজ সাঁতরে তীরে উঠি দুজনে। জল উষ্ণ ছিল। নিস্তব্ধ চরাচর। যেন পৃথিবীতে পড়ে আছি আমরা দুজন নরনারী। বালিয়াড়ি ভেঙে বাংলোয় পৌঁছই।

বাংলোয় পা দিয়ে হঠাৎ থেমে মর্গট ঘুরে মুখ তোলেন। আমার দুটো হাত তার দীঘল মসৃণ পশ্চাত ছুঁয়ে ক্রমে ওপরে, ঢেউ খেলানো নিতম্বে এসে থামে। নিবিড় করে কাছে টেনে নিই। কতক্ষণ কেটে যায় এভাবে। একসময় খেলা ভাঙে। মর্গট বলেন–ভারী সুন্দর কাটলো লিউ। আমি আবার আসবো। তুমি কিছু মনে করবে না তো?

–কি যে বল। ভাবলে কি করে কিছু মনে করবো?

–আমায় পৌঁছে দিয়ে আসবে?

–এখন? বাকী রাতটা থেকে যাও না।

–থাকতে চাইলেই কি থাকা যায়। ড্যাডির লোক আমায় পাহারা দেয়। সারারাত বাইরে থাকলে নির্ঘাৎ ড্যাডি জানতে পারবেন।

–বেশ, তবে চল।

আমরা গাড়িতে উঠি। ফাঁকা পথ। মাথায় অজস্র চিন্তা। প্রশ্ন করার এই সুবর্ণ সুযোগ। অত্যন্ত সহজে জিজ্ঞাসা করি–তোমার বাবা প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভাড়া করেছিলেন কেন?

সীটে মাথা রেখে মর্গট উত্তর দেন তাহলে নিজমূর্তি ধরেছ। তুমি কি ভাবো সব প্রশ্নের উত্তর আমি জানি। জানি না। তবে আন্দাজ করতে পারি। তিনি গোয়েন্দা নিযুক্ত করলে, তা করেছেন নিজের স্ত্রীর ওপর নজর রাখতে।

–স্ত্রীর ওপর নজরদারীর কোন কারণ ছিল কি?

বহু কারণ থাকতে পারে। এতদিন কেন করেননি তাই ভেবে অবাক হচ্ছি। ঐ মহিলার চারপাশে সর্বদা কিছু ভ্রমর গুঞ্জন করতো। বর্তমানে থ্রিসবির সাথে তার ঘনিষ্টতা চলছে। লোকটা ভয়ানক। সম্ভবতঃ এ নিয়ে বাবা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বাবার উচিত এখনি ডিভোর্স করা। তাহলে আমি বাড়িতে থাকতে পারি।

তুমি কি তাই চাও।

–কেউই বাড়ি ছাড়া থাকতে চায় না। ব্রিজিত আর আমার একসাথে থাকা অসম্ভব।

–তোমার ওপর নজর রাখতে তোমার বাবা সিপ্পিকে নিযুক্ত করেন নি, মনে হয়।

–সেজন্য পয়সা খরচ করে গোয়েন্দা রাখার দরকার ছিল না বাপির। আমার পরিচারিকাই যথেষ্ট স্পাইগিরি করে তাঁকে। মাইলখানেক পথ গিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে মর্গট–ব্রিজিতের ওপর নজর রাখার কথা ভাবছো?

না। সিপ্পির খুনের সাথে ওনার যোগসাজস আছে বলে মনে হয় না। ব্রিজিতের ওপর নজর রাখতে গিয়ে সিপ্পি এমন কিছু আবিস্কার করে ফেলেন, যার কাছে ব্রিজিতের ওপর নজরদারী মূল্যহীন। সেজন্য খুন হতে হয় তাকে।

–ওহ তুমি সত্যি তাই ভাবছো?

–অনুমান করছি।

–আচ্ছা, সিপ্পির কাছে এমন প্রমাণ যদি থাকে যাতে ড্যাডি ব্রিজিতকে ডিভোর্স করতে পারেন। আর যদি তা ব্রিজিত জানতে পারে তবে সে মাথা ঠাণ্ডা করে বসে থাকবে না। যথেষ্ট অর্থ তার নেই। ড্যাডি তাকে ডিভোর্স করলে ব্রিজিত তা পছন্দ করবে না। ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে।

–তোমার কি মনে হয় তিনি সিপ্পিকে খুন করেছেন?

না। তবে থ্রিসবি করতে পারে। তুমিতো দেখোনি সেকত ভয়ঙ্কর। সিপ্পি যদি তেমন প্রমাণ পান এবং তার ফলে ব্রিজিত যদি তাকে টাকা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে প্রিসবি সিপ্পিকে খুন করতে পারে।

থ্রিসবিকে দেখা দরকার একবার। কোথায় পাবো তাকে?

–শহরের শেষপ্রান্তে ছোট্ট নোংরা একটা জায়গা আছে। হোয়াইট চ্যাটিউ। দেখা যেতে পারে ওখানে। মর্গটের কণ্ঠের তিক্ততা আমায় আকর্ষণ করে–সে শুধু ব্রিজিতকেই আনন্দ দেয় না। টাকা থাকলে যে কোন মেয়েকেই সে আমন্ত্রণ জানায়। এরকম লোক আকছার দেখা যায়। ডানদিকে, সোজা ফ্রাঙ্কলিন আর্মস ধরো।

আমি তার নির্দেশমতো গাড়ি চালাই। অবশেষে তার অ্যাপার্টমেন্টের কাছে থামি।

আমার হাত স্পর্শ করে তিনি বলেন–শুভরাত্রি, আবার তোমায় ডাকবো। থ্রিসবি সম্বন্ধে সাবধান।

গাড়ির দরজা খুলে মর্গট নেমে যান। আমি গাড়ি স্টার্ট দিই। এবার ফেরার পালা।

ফেরার পথে ভাবনা আসে। মগর্ট থেকে কর্ডেজ। সিপ্পির স্যুটকেসে যে ম্যাচ ফোল্ডার পেয়েছি তার প্রতিটি পাতার দাম পাঁচশো ডলার। কর্ডেজ ম্যাচ ফোল্ডারে তিনটে পাতা ছিঁড়ে তিনজনকে দিয়ে প্রত্যেকের থেকে পাঁচশো ডলার নিয়েছে। সিপ্পি যেভাবেই হোক একটি ম্যাচ ফোল্ডার পেয়েছিল। যার জন্য প্রথমে সিপ্পির ওপরে পরে আমার ঘরে দুষ্কৃতী তছনছ করে গেছে। সিগির ঘরে কিছু না পেলেও আমার ঘরে পেয়েছে। আসল ম্যাচ ফোল্ডার নিয়ে তার স্থানে নকল। ম্যাচ ফোল্ডার রেখে সে ভেবেছে, ফোল্ডারের পেছনে সাঁটা সংখ্যা ছাপা লেবেলটা আমার নজরে পড়েনি। অর্থাৎ ঐ সংখ্যাগুলোর একটা তাৎপর্য আছে। হয়তো ম্যাচ ফোল্ডারের জন্যই সিপ্পিকে প্রাণ দিতে হল। আসলে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এগুলো ছাড়া এখন উপায় নেই। আরো তথ্য প্রমাণ চাই।

রাত সোয়া তিনটে।

বাংলোয় ফিরে সদ্য হুইস্কি সোডা গ্লাসে ঢেলে বার কাউন্টারে যাচ্ছি হঠাৎ নজরে আসে, লাউঞ্জের ধারের টেবিলে মর্গটের হাতব্যাগ পড়ে আছে। ব্যাগ খুলি। কি আশ্চর্য! ব্যাগের ভেতর থেকে হাতে উঠে আসে একটা ম্যাচ ফোল্ডার। পেছনে দেখি, হ্যাঁ সাঁটা লেবেলে স্পষ্ট ছাপ.. ca5i148 থেকে C45160 পর্যন্ত।

এই সেই ম্যাচ ফোল্ডার যা সিপ্পির স্যুটকেস থেকে পেয়েছি। এটাই আমি কার্পেটের তলায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। ফোল্ডার পকেটে রেখে রিসিভার তুলি। –হ্যালো?

–অ্যাই, তুমি...লিউ? উত্তেজনাপূর্ণ গলা মর্গটের।

বলতে হবে না। জানি কি হারিয়েছ তুমি?

–হ্যাঁ, আমার ব্যাগ। তুমি পেয়েছে?

–ওটা টেবিলে পড়ে আছে এখন।

–ওহ বাঁচলাম। বুঝতে পারছিলাম না ওটা ক্লাবে না বাংলোয় ফেলে এসেছি। আমি সবসময় জিনিস হারাই। কাল সকালে ব্যাগটা নিয়ে আসবো, না তুমি দিয়ে যাবে?

–ঠিক আছে। কাল সকালে যখন হোক পৌঁছে দেব।

থ্যাঙ্ক য়ু ডার্লিং, একটু স্তব্ধতা। তারপর মর্গট বলল–লিউ এখনো তোমার কাছে আছি...তোমার কথা ভাবছি।

পকেটে হাত দিয়ে ফ্লোল্ডার ছুঁই। বলি–আমিও ভাবছি তোমার কথা।

...শুভরাত লিউ।

...শুভরাত, সুন্দর।

সকাল এগারোটা কুড়ি।

বাংলো থেকে গাড়ি ছুটিয়ে এসে গেছি অ্যারো পয়েন্ট। বিচ রোডে সাইনবোর্ড জানায় এই পথে স্কুল অব সিরামিক্স দ্য ট্রেঞ্জার আইল্যান্ড অফ ওরিজিন্যাল ডিজাইন।

ট্যুরিস্টদের সাথে ভেতরে ঢুকি। কুড়ি ফুট চওড়া, পঞ্চাশ ফুট লম্বা ঘর। দু–ধারে লম্বা টেবিল নানান আকারের, নানান রঙের বিচিত্র নক্সাদার চীনে মাটির মহার্ঘ সব জিনিসপত্র। প্রত্যেকটি জিনিসের পিছনে একজন করে মহিলা দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের পরনে সাদা কোট, বুক পকেটে মাছের ছুরি। এই ধরনের কোন কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে কি থেলমা কদিন আগে খদ্দের সামলাতো? ঘরের শেষ প্রান্তে রঙিন পর্দা। বোধহয় আর একটা ঘর আছে ওদিকে। আমি বিভিন্ন সরঞ্জাম দেখার ভান করে বারে বারে ঐ পর্দার দিকে দেখছি। সামনের কাউন্টারের সেলস গার্ল আমার ভাবভঙ্গি দেখে বলে–কোন জিনিস পছন্দ হচ্ছে না? উত্তরে বলি–আপনিই বলুন, এখানকার কোন বস্তুই কি বিয়ের উপহারের যোগ্য?

–একটু দাঁড়ান। মেয়েটি কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে দরজার কাছের প্রৌঢ়াকে কি যেন বলে। প্রৌঢ়া অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে। হাতে হীরের আংটি বা পরণে আমার দুর্লভ পোষাক নেই। মেয়েটি ফিরে এসে জানায়–মিস ম্যাডক্স আপনাকে সাহায্য করবেন। আমি এগিয়ে যাই। প্রৌঢ়া সীট ছেড়ে উঠে আসেন। বলেন–আমাদের আরো অঢেল সামগ্রী আছে। দাম একটু বেশী।

–তা হোক, জীবনে বিয়েতো একবারই। চলুন, সেগুলো দেখাযাক। প্রৌঢ়া ঘরের শেষ প্রান্তের রঙিন পর্দা সরিয়ে আমাকে নিয়ে মাঝারি আকারের এক ঘরে ঢুকলেন।

এ ঘরে মাত্র ছটা একই মাপের মুর্তি–স্যান্ডে রাখা।

–হয়তো এগুলোর মধ্যে পছন্দ হবে আপনার।

চারদিক তাকিয়ে বলি–আগের চেয়ে ভালো।

এমন সময় ঘরে ঢোকেন সাদা মুখের এক ভদ্রলোক। তখনি চিনতে পারি। এই ভদ্রলোকই দানাগুয়ে, যিনি কর্ডেজের কাছ থেকে এক হাজার ডলার দিয়ে দুটো ম্যাচ ফোল্ডারের পাতা কিনেছিলেন।

তৃতীয় ঘর

০৯.

দানাগুয়ে ঘরে ঢুকে দু-পা পিছিয়ে আসেন। দ্বিধান্বিত দেখায় তাকে। তারপর চলে যান আমার পাশ দিয়ে। প্রথম ঘরের মত এ ঘরের শেষপ্রান্তেও রঙিন পর্দা। সেই পর্দা সরিয়ে ঢুকে যান। অর্থাৎ, ওটা তৃতীয় ঘর।

ঘুরে ঘুরে মূর্তি দেখতে থাকি। বুড়ি ঠিক নজর রাখে। মূর্তি দেখার অভিনয় করে পায়ে পায়ে ঘরের শেষপ্রান্তে এসে থামি। পর্দার ফাঁক দিয়ে এখান থেকে পাশের ঘর সহজেই দেখা যায়। পর্দা সরিয়ে দানাগুয়ে ঢোকেন। মুখে অপরাধী ভাব নিয়ে এ পায়ে প্রথম ঘরের দিকে চলে যান। মিস ম্যাডক্স তখনো তাকিয়ে আছে। হাসি অন্তর্হিত। চোখে সন্দেহ।

আমি ম্যাচ ফোল্ডার দেখাই। দুরু দুরু করে বুক। ধরা পড়ে যাবো নাতো? মর্গটের জিনিস, সেটা একপলক দেখে অভিজ্ঞা ম্যাডক্স পর্দা সরিয়ে আমায় ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত দেয়।

ধন্যবাদ। এতক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলাম যাতে আমায় কেউ লক্ষ্য না করে। তার শূন্য শীতল দৃষ্টি বলে দিল, ভীষণ বোকার মত কথা বলে ফেলেছি।

পর্দার পরদরজা। মধ্যেভঁই হয়ে পড়ে আছে একরাশ ব্যবহৃতম্যাচ ফোল্ডার। একটাতুলে দেখি, ভেতরের পাতা ছেঁড়া। প্রত্যেকটির পিছনের সাঁটা লেবেল ছেঁড়া, মাথাগুলো

পোড়ানো। জানি আর নিস্তার নেই। সামনের ঘরেঅবধারিতমৃত্যু ওৎপেতে আছে। কিংবাতুমুলগণ্ডগোল। এবার ধরা পড়ার সময়। হঠাৎ খেয়াল হয়, আরে, মাঝের ঘর থেকে তো ম্যাডক্স আমায় দেখতে পাচ্ছেন না।

অবিকল দানাগুয়েের মত মুখ করে বেরিয়ে এসে ত্রস্ত পায়ে স্কুল থেকে পথে নামি। পার্কিংলট থেকে গাড়ি ছোটাই ফ্র্যাঙ্কলিন আর্মস অভিমুখে। পকেট থেকে ম্যাচ ফোল্ডার বের করে মর্গটের ব্যাগে রাখি। কিছুক্ষণের মধ্যে তার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছাই। রিসেপশন ক্লার্ককে নাম বলতে সে বারে গিয়ে বসতে বলে। উনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছে। বারে বসে থাকি।

দশ মিনিটও কাটে না, মর্গট আসে। পরনে সাঁতারের পোষাক ঢেকেছে বিচকোট, পায়ে স্যান্ডেল।

বসতে বসতে তিনি বলেন–বেশীক্ষণ বসবো না, লিউ। এক জায়গায় লাঞ্চের ডেট আছে। ব্যাগ এনেছো?

ব্যাগ টেবিলে রাখলাম। এর জন্য পুরস্কার পাওনা রইল।

চোখে কামনার ছটা–খুশি মনে দেবো। ধন্যবাদ লিউ। আমি এত বেখেয়ালী..বলতে বলতে টেবিল থেকে ব্যাগটা বিচব্যাগে ভরে নেন।

–এক মিনিট দাঁড়াও। ব্যাগটা খুলে দেখলে না কিছু খোয়া গেছে কিনা?

অবাক দৃষ্টিতে মর্গট বলেন–কি খোয়া যাবে?

–তোমার ব্যাগে একটা ম্যাচ ফোল্ডার আছে।

–তাই নাকি? ম্যাচ ফোল্ডার! এতে তোমার কৌতূহল কেন?

প্রায় বড় ব্যাগ, তার ভিতর ছোট ব্যাগ খুলে মর্গট ফোল্ডারটা তুলে বলেন–এটাই তো?

–হ্যাঁ, কোত্থেকে পেলে?

জানি না। ওটা ব্যাগে আছে তাই জানি না। লিউ এত কৌতূহল কেন?

কারণ আছে। এটা সিপ্পির ব্যাগ থেকে পেয়েছি এবং আমার হোটেল রুম থেকে চুরি গেছে। পরিবর্তে এক নকল ফোল্ডার রেখে যায় চোর। এখন দেখছি তোমার ব্যাগে এটা।

–এটা তুমি কোথায় পেয়েছ?

–বোধহয় গতরাতে ক্লাব থেকে এনেছি। কাল ডিনার খেয়েছি সেখানে। ও হা হা, মনে পড়েছে। আমি লাইটার নিতে ভুলে গেছিলাম। লাইটার নিতে না ভুললে কখনই দেশলাই বা ম্যাচ ফোল্ডার ব্যবহার করি না। টুপি রাখার ট্রে থেকেই বোধহয় ওটা নিয়েছি।

কাদের সাথে ডিনার সেরেছো?

–পার্টি ছিল। সাকুল্যে পাঁচজন ছিলাম। আমি, ব্রিজিৎ, থ্রিসবি, দানাগুয়েনামের এক ভদ্রলোক, বন্ধু ভোরিস ও যার সঙ্গে প্রায় টেনিস খেলি সেই হ্যারি লুকাস।

মর্গট, এই ম্যাচ ফোল্ডার আমি চাই। লেফটেন্যান্ট র‍্যানকিনকে দেখাবো।

–কিন্তু লিউ, আমি পুলিশের ব্যাপারে জড়াতে চাইনা। তাহলে ড্যাডির কানে উঠবে কথাটা।

–চিন্তার কারণ নেই। তোমাকে জড়াবার ক্ষমতা তোমার বাবাকে এড়িয়ে র‍্যানকিনের নেই।

মর্গট ফোল্ডার দেন। বলেন–প্লিজ, আমায় জড়িওনা। যদি খবরের কাগজে প্রকাশ পায়...। তার হাতে মৃদু চাপড় মেরে বলি–ভেবো না।

তুমি কি এখন থ্রিসবির কাছে যাচ্ছ? তাকে পাবে কোথায়? মাউন্টেন রোড ধরে পাঁচমাইল গিয়ে সাইন পোস্ট দেখবে দি ক্রিস্ট। ঐখানে পাবে হোয়াইট চ্যাটিড। আচ্ছা, শীঘ্রই দেখা হবে লিউ। ও কে।

হোয়াইট চ্যাটিউ? নীল, টালির সারিবদ্ধ বাড়ি। কাঠের গেট। গায়ে বাড়ির নাম। গাড়ি পার্ক করে এগিয়ে গেলাম, কলিংবেলে হাত রাখতে যাবো, ভেজানো দরজা থেকে ভেসে আসে সংলাপ–পুরুষ কণ্ঠ–বেশ, তুমি ড্রিঙ্ক না করলে আমিই করি। খানিক নীরবতা।

নারীকণ্ঠ–ঈশ্বরের দোহাই। এখনই শুরু করো না জ্যাকুইস। তোমার সাথে কথা আছে।

পুরুষকণ্ঠ–আরে সেজন্যই তো মদ খেতে হবে। না হলে তোমার প্রলাপ হজম করবো কি করে?

নারী–তুমি একটা শয়তান। কুৎসিত শোনায় নারীকণ্ঠ। আমি নিঃশব্দে দরজার আড়ালে দাঁড়াই। ভেজানো দরজার ফাঁকে দৃশ্যমান বেশ বড় ঘর। ছত্রিশ–সাঁইত্রিশ বছরের অপূর্ব এক রমনী লাউঞ্জিং চেয়ারে গা এলিয়ে বসে। হ্যাঁ চেনা যায়। ইনিই ব্রিজিৎ ক্রিডি। প্রাক্তন অভিনেত্রী, লী ক্রিডির স্ত্রী।

চোখে পড়ে থ্রিসবিকে। সুঠাম, রোদজ্বলা চামড়া, কালো ঝাকড়া চুল, নীল চোখ, গোঁফযুক্ত মুখটি চৌকস। পরনে লাল সর্টস্ ও স্যান্ডেল। ডানহাতে মদভর্তি গ্লাস। ঠোঁটে সিগারেট। প্রশ্ন করে ব্রিজিৎ–কোথায় ছিলে কাল রাতে?

কতবার বলবো এখানে ছিলাম। টিভিতে মারপিট দেখছিলাম।

না। তুমি তা করোনি। আমি ক্লাব থেকে ফোন করে কোন সাড়া পাইনি।

–আমি সব সময় ফোন ধরি না। ব্রিজিৎ ডার্লিং, আমি চাই না কেউ বিরক্ত করুক। তাই রিং শুনেও ধরিনি।

সহসা উঠে দাঁড়ান ব্রিজিৎ। চোখে আগুন–মিথ্যে কথা, তুমি ছিলে না এখানে। আমি এসে দেখেছি তুমি নেই। আলো নেভানো এমনকি গ্যারাজে গাড়ি নেই। তোমার এত সাহস, মিথ্যে বলো? কি করছিলে?

থ্রিসবির মুখ থেকে প্লেবয়ের হাসি উধাও। কঠোর হিংস্রতা ফুটে ওঠে–সেজন্য ছুটে এসেছো? কত সস্তা করে ফেলেছে নিজেকে তুমি! প্রথমত একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগালে আমার ওপর নজর রাখতে। সে মারা গেলে নিজেই গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছ? যথেষ্ট হয়েছে। আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ।

বীভৎস চিৎকার করে ওঠে ব্রিজিৎ–মেয়েটা কে?

সিগারেট নিভিয়ে থ্রিসবি বলেন–যথেষ্ট হয়েছে আজ। তুমি চাইলে আমি আর সম্পর্ক রাখব না। এখানেই শেষ হোক।

–সে কি মর্গট? তার সাথে শুরু করেছে?

মর্গট তোমার থেকে দশ বছরের ছোট। যুবতী ও ঢের বেশী সুন্দরী। তবে দেখছি তোমরা দুজনেই মাদকাসক্ত, অতিরিক্ত যৌন পিপাসু ও বিরক্তিকর। যাগে এবার তুমি আসবে, আমার লাঞ্চের নিমন্ত্রণ আছে।

মেয়েটা মর্গটি, তাইনা? সে এখনো ভালোবাসে তোমায়? সে ঠিক করেছে তোমাকে ছিনিয়ে নেবে আমার কাছ থেকে? উত্তেজিত ও রাগমিশ্রিত গলা কাপে ব্রিজিতের।

দ্যাখো সিন ক্রিয়েট করোনা। তুমি কি যাবে এখন?

কাল কোন মাগীর সঙ্গে কাটিয়েছ না জেনো যাবো না।

–বেশ, শোন তবে। মেয়েটা একদম তাজা। সোনালীচুল, সদ্য যুবতী। রাস্তায় একা হাঁটছিল, আলাপ হয়ে গেল। তার সাথেই রাত কাটিয়েছি।

লম্পট! কুত্তির বাচ্চা–ব্রিজিতের মুখে রক্ত ছায়। রাগে কণ্ঠ কাপে মিথ্যে কথা। মাগীটা মর্গট

–তুমি না গেলে আমি যাচ্ছি। পরে বোলনা যে আমি প্রাক্তন প্রেমিকাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। থ্রিসবিকে দেখা যায় না। বোতলের ছিপি খোলার শব্দ। ব্রিজিৎবলেন–একসাথে আমরা অনেক এনজয় করেছি। আজ যে যার পথ দেখার সময় এসেছে। ঠিক আছে, আলাদা হয়ে যাবো। তবে তুমি ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই আমার থেকে কিছু ডলার ধার নিয়েছিলে। মনে পড়ে? , ঠিক তেরো হাজার ডলার।

চাইতে পারো, আমাকে জবরদস্তি করতে চাইলে কোর্টে কেস করো। মনে হয় তোমার স্বামী এ বিষয়ে তোমায় যথেষ্ট সাহায্য করবেন। তিনি আমায় এত টাকা দিয়েছ শুনলে তোমায় নির্ঘাৎ ডিভোর্স করবেন।

ব্রিজিৎ চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করেন–তোমার সাথে কোনদিন আমার কিছু হয়েছিল তা ভুলে যাবো। তোমার বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

চেয়ারে ঘুরে বসেন থ্রিসবি–উঁহু, অতটা কঠোর হোয়োনা। দেখো, তুমি যৌন অতৃপ্ত রমনী। আমি তোমার খিদে মিটিয়েছি। তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে। ভেবে দেখো ব্রিজিৎ, বিচ্ছেদের সময় তিক্ততা রেখো না। আমার মত অনেক সুন্দর চেহারার যুবক

পাবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অক্লেশে আমায় ভুলে যাবে। আর ক-খ-নো দেখা হবে না আমাদের?

চোখ জ্বলে ওঠে ব্রিজিতের। টেবিল থেকে তুলে নেন কিটব্যাগ। বেশ তাই হোক। ব্রিজিতের হাসিতে নির্মম কৌতুক ঝরে। শিরদাঁড়া কাঁপানো হিমবাহ-তোমায় খুন করছি জ্যাকুইস। আমি তোমায় না পেলে, আর কাউকে পেতে দেবোনা। ব্যাগের ভেতর থেকে, ব্রিজিতের হাতে উঠে আসে পয়েন্ট আটত্রিশের স্বয়ংক্রিয় রিভলভার। থ্রিসবির দিকে নিশানা।

.

১০.

ধীরে উঠে দাঁড়ান ব্রিজিৎ। বন্দুক হাতে যেন বিকিনী পরিহিতা বাঘিনী। পাথুরে মুখ। বন্দুকের রূপালী ট্রিগারে আঙুল। নিচুস্বরে বললেন-হ্যাঁ, জ্যাকুইস, আমাকে ঢের জ্বালিয়েছে। এবার সেই যন্ত্রণার কিছু ভাগ নাও।

ঠোঁটে জিভ বোলান থ্রিসবি-ব্রিজিৎ বন্দুক নামাও। এসো আমরা আলোচনায় বসি।

বড় দেরী হয়ে গেছে জ্যাকুইস। ঢের ক্ষমা করেছি। আর না, লম্পট, ভীতুর ডিম।

ঠিক এসময়ে নিঃশব্দে ঘরে পা রাখি। থ্রিসবি আমাকে দেখতে পায়। ব্রিজিতের পেছনে এসে দাঁড়াই। বন্দুক তুলেছেন ব্রিজিৎ। লাফিয়ে পড়ি। তার হাত সজোরে নিচে নামিয়ে

দিতে, লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট কার্পেট গর্ত করে জানলা দিয়ে ছুটে যায়। হাত মুচড়ে বন্দুক ছিনিয়ে নিই। অবাক চোখে ব্রিজিৎ তাকান। তার ভয়ার্ত মুখে চামড়া ঝুলে পড়ে। কিছুক্ষণ ওই ভাবে চেয়ে থেকে, টেবিল থেকে ব্যাগ তুলে নিয়ে ঝড়ের বেগে নিষ্ক্রান্ত হন। বাইরে গাড়ির স্টার্ট নেবার শব্দ।

বন্দুক টেবিলে রেখে হাত মুছি রুমালে। স্তব্ধতা যেন ভারী পাথর। থ্রিসবি দেখছেন আমাকে। নরম সুরে বলি, উনি খুন করতে গেলে বড়জোর আপনার পায়ে একটা গুলি লাগত।

সম্বিৎ ফিরে পান প্রিসবি। তখনো ভয়ার্ত দু-চোখ, কোনরকমে উচ্চারণ করেন, নিউরোটিক মাগী! বন্দুক পেল কোথায়? তা আপনি উদয় হলেন কোত্থেকে?

ট্রেড কার্ড দিই। থ্রিসবি চোখ বুলিয়ে নেন, দ্য স্টার এজেন্সি, আরে। এই এজেন্সির একজন, আচমকা থেমে মুখ ঘোরান। চোখে ভয়, হতাশা, বিহ্বলতার সংমিশ্রণ।

–ঠিক, সিপ্পি আমার পার্টনার ছিলেন।

–আমার ওপর নজরদারীর জন্য নিযুক্ত হন?

না। দুর্ঘটনার পর আমি এসেছি। আপনার সাথে কথা বলতে চাই।

রুমালে মুখ মোছেন থ্রিসবি। শূন্য গ্লাস নিয়ে বার টেবিলে যান–মদ চলবে?

চলতে পারে, ধন্যবাদ।

দু–গ্লাসে মদ ঢেলে, এক গ্লাস আমায় দেন। সিগারেট ধরিয়ে এক বুক ঘোয়া টেনে বলেন বলুন, কি জানতে চান?

–ব্রিজিৎ কি আপনার ওপর নজর রাখতে সিপ্পিকে নিয়োগ করেন?

থ্রিসবি দ্বিধান্বিত–পুলিশ কেসে জড়াবো নাতো?

–হ্যাঁ, সিপ্পিকে ও ভাড়া করেছিল।

–কেন?

—-ওর ধারণা, আমি ওর সৎমেয়ে মর্গটের সাথে প্রেম চালাচ্ছি।

আমি গ্লাসে চুমুক দিই, সিগারেট ধরাই, তবে কার সাথে আপনার প্রেম চলছে?

–সেটা বলার মত নাকি। স্‌ধারণ এক মেয়ে।

সিপ্পি কি সে কথা ব্রিজিৎকে জানিয়েছিলেন?

–হা জানিয়েছিলেন। তাই ব্রিজিৎ মেয়েটারকাছে গিয়ে তাকে ঈশ্বরের ভয় দেখায়। পাপের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বলে।

–ব্রিজিং কি সফল হয়েছিলেন?

–বোধ হয়। মেয়েটাকে আর দেখতে পাই না।

–তারপর কি হল?

–ব্রিজিৎ আমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে, বচসা হয়। গত পরশু ঠিক করি, অনেক হয়েছে। এবার সম্পর্ক চুকিয়ে দেবো। বাকীটা তো দেখলেন।

আচ্ছা মিস্টার থ্রিসবি, সিপ্পি যাকে ফলো করছিলেন, আপনার সেই প্রেমিকার নাম কি থেলমা কাজিন?

মুহূর্তে মুখ–চোখের অদ্ভুত পরিবর্তন হল। ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন, দেখুন, পুলিশী জেরা করবেন না, সে এক সাধারণ মেয়ে।

–অনেক কথাই বললেন, বলুন না, মেয়েটা থেলমা কাজিন?

–হ্যাঁ হ্যাঁ সেই, এবার খুশি তো?

–কি করে আলাপ হল?

–পটারী প্লেসে ব্রিজিৎ কেনাকাটা করতে নিয়ে গিয়েছিল। তখনই টের পাই মেয়েটা আমার প্রেমে পড়ে গেছে।

কি করে বুঝলেন আপনাদের ওপর সিপ্পি নজর রাখছেন?

থেলমা বলেছিল। সে তার কর্মস্থানে আমায় ডেকে জানিয়েছিল, আমার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে তাকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। বুঝতে পাচ্ছিলাম, থেলমা না ছাড়লে ব্রিজিৎ শায়েস্তা করবে আমায়।

–খুন করেছে?

মনে হয় খুনী সিপ্পিকে নয়, থেলমাকে খুন করতে গেছিল। সম্ভবতঃ থেলমাকে বাঁচাতে গিয়ে সিপ্পি খুন হয়।

–তাহলে ব্রিজিৎ জোড়া খুনের আসামী?

আমি তা বলিনি, ব্রিজিৎ আইসপিক দিয়ে সিপ্পিকে খুন করছে–তা আমি বা আপনি কেউই। দেখিনি।

–ব্রিজিৎ ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে খুন করাতে পারে। যেমন হার্জ?

থ্রিসবি চমকে ওঠেন। করতে পারে, আমার বোধহয় এ শহরে থাকা নিরাপদ নয়। তাড়াতাড়ি কেটে পড়তে হবে।

আমি ঠোঁটে দ্বিতীয় সিগারেট রেখে পকেট থেকে ম্যাচ ফোল্ডার নিয়ে এমনভাবে ধরাই যাতে ওটা থ্রিসবির চোখে পড়ে। বলি–হার্জ সম্বন্ধে কি জানেন? ওর প্রতিক্রিয়া দেখার মত। ফোল্ডার থেকে ওর দৃষ্টি সরে না। আমি নিশ্চিন্তে সিগারেট ধরিয়ে ওর ইতস্ততঃ ভাব দেখে প্রশ্ন করি–কি ব্যাপার?

না মানে, আপনি মাসকেটিয়ার্স ক্লাবের মেম্বার জানতাম না।

মেম্বার নই। এটা একজনের কাছে থেকে নিয়েছি।

–ওঃ, একটু বেরুবো। লাঞ্চের ডেট আছে। উঠে দাঁড়ান তিনি।

–আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। হার্জ সম্বন্ধে কি জানেন?

–লী ক্রিডির ভাড়াটে গুণ্ডা, ওর সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন কেন? যাক ঠিক সময়ে এসে বাঁচিয়েছেন। ধন্যবাদ।

–আচ্ছা পরে দেখা হবে।

অত্যন্ত শ্লথ গতিতে ফিরলাম সেন্ট রাফাইল সিটিতে। এক ড্রাগ স্টোর্সের সামণে গাড়ি থামাই, সিধে বুথে গিয়ে ফোন করি ক্রিডির বাড়ি। কিছুক্ষণ বিচিত্র যন্ত্র শব্দ। সেক্রেটারীর গলা ভেসে আসে, বলিমিসেস ক্রিডির সাথে দেখা করতে চাই। আজ সকালে ওনার সাথে দেখা হয়েছিল। ওনার একটা জিনিস আমার কাছে আছে। জিজ্ঞাসা করুন, উনি কখন দেখা করতে পারবেন।

–আপনার নাম?

–নামটা জরুরী নয়, যা বললাম তাই বলুন।

–প্লিজ, ধরুন এক মিনিট।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর সেক্রেটারির গলা–তিনটের সময় দেখা করতে পারেন।

–বেশ, যাবো আমি, বলে রিসিভার নাবাই। ঘড়িতে দেখি তিনটে বাজতে তিন মিনিট বাকী। পার্কিং লটে গাড়ি থামাতে কানে ধাক্কা দেয় পরিচিত কণ্ঠস্বর–মিস্টার ব্রান্ডন? এভাবে পুরোনো দোস্তকে এড়িয়ে যেতে হয় বুঝি?

–দেখি সেই বাটলার ফাল্টনের চেনা মুখ। সংক্ষেপে বলি মিসেস ক্রিডির সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

মনে হয় তিনি এখনি এসে পড়বেন। আমি ভেতর থেকে খোঁজ নিয়ে আসছি।

এক মিনিটের মধ্যে ফেরেন তরুণী। ঘরে ঢুকে দেখি ছবির মত জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস ক্রিডি। পরনে হলুদ স্ন্যাক্স, সাদা সার্ট। দৃষ্টি গোলাপ বাগানে প্রসারিত।

হলিউডের ফিল্মের মত স্লো মোশানে ফেরেন সতর্ক চোখে। বুঝি সেলুলয়েডে ধরে রাখা ফ্রেম।

সামনের চেয়ার টেনে বসে পড়ি।

–আপনাকে বসতে বলিনি, হলিউডীয় চিত্রার্পিতের ভঙ্গি ব্রিজিতের।

বলেননি, কিন্তু আমি ক্লান্ত। সারাদিন ধকল গেছে বড়। নিন, আপনার বন্দুক ফেরৎ দিতে এসেছি।

পকেট থেকে পয়েন্ট আটত্রিশের পিস্তল বের করে, ম্যাগাজিন খুলে এগিয়ে দিই।

পিস্তল তুলে নিয়ে ব্রিজিৎ বলেন কি ভেবেছেন। ব্ল্যাকমেল করবেন আমাকে?

–আলবাৎ ব্ল্যাক মেইল করতে পারি আপনাকে। উনিশশো আটচল্লিশ–এর অস্কার বিজয়িনীর অভিনয় ছেড়ে আমার কথা চুপচাপ শুনুন।

ওহ, ঠিক আছে। কত টাকা চাই আপনার?

–আমাকে আপনার বয়ফ্রেণ্ড ভাববেন না মিসেস ক্রিডি, যে টাকার ধান্দায় ঘোরে। আমি কিছু খবরাখবর চাই।

কি খবর?

অন্য কারোর ওপর নজর রাখার জন্য কি সিপ্পিকে ভাড়া করেছিলেন?

না।

–আপনি কি জানেন সম্প্রতি থেলমা কাজিন নামে একটি মেয়ের সাথে থ্রিসবি প্রেম করছেন?

–না। ওরকম কোনো নাম শুনিনি, চিনিও না।

–থ্রিসবি আমায় যা বলেছেন তা লেফটেন্যান্ট র‍্যানকিনকে জানালে আপনার আপত্তি নেই বোধ হয়।

–আপনি যা খুশি করতে পারেন? তবে সাবধান, আমাকে বিপদে ফেলতে গেলে আপনাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব। ভাববেন না। তা আমি পারিনা, আপনার বকবক আর শুনতে চাই না। এবার কেটে পড়ুন।

এবার শেষ অস্ত্র সামনে রাখি। ম্যাচ ফোল্ডার....এটা কি আপনার?

— থ্রিসবির মত কোন প্রতিক্রিয়া ফোটে না ব্রিজিতের মুখে বুঝতে পাচ্ছি না কি বলতে চান? এখন চলে যাওয়া উচিত আপনার। ব্রিজিত উঠে বেল টেপেন। দরজা খুলে ঢোকেন সেক্রেটারী। যেতে যেতে বলি–আবার দেখা হতে পারে।

বাইরের ঘরে পা দিতেই দেখতে পাই দুরের চেয়ারে হিল্টন বসে আছেন। বলেন মিসেস ক্রিডির সাথে কথা বলা শেষ হলে মিস্টার ক্রিডি আপনাকে তার সাথে দেখা করতে বলেছেন।

–বেশ, দেখা যাক, চলুন।

মিস্টার ক্রিডির ঘরে দরজা খুলে হিল্টন অনুচ্চ স্বরে বলেন–স্যার, মিস্টার ব্রান্ডন এসেছে।

আমি ঘরে ঢুকতে ক্রিডি বলেন–আমার স্ত্রীর সাথে দেখা হল?

–এজন্য ডেকেছিলেন? তাহলে আমি যাই।

কয়েক মুহূর্ত আমায় জরিপ করেন ক্রিডি। টেবিল থেকে কাগজকাটা ছুরি চোখের সামনে ঘুরিয়ে–ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলেন–আপনাদের এজেন্সি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি, শুনেছি বিত্তবান আপনারা। লাভজনক ব্যবসা ভালই চলছে এবং মূলধন তিন হাজার ডলার। উঠতি ব্যবসা কিনতে আমি পছন্দ করি। আপনাদের ব্যবসা কিনতে আমি প্রস্তুত। দশ হাজার ডলার দিচ্ছি। সুনাম আর ওই, কি যেন বললেন, হ্যাঁ, ব্যক্তিত্বের জন্য।

মনে মনে ভাবি, বিক্রি করলে সিপ্পি হত্যারহস্যের তদন্ত ধামা চাপা পড়ে যাবে, আমি তদন্ত চালাবই। কেনা যাবে না আমায়।

–আর দ্বিধা করবেন না। আপনার পার্টনার সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছি। অত্যন্ত বাজে লোক। তার সাথে আর কিছুদিন কাজ করলে আপনার কারবার ডকে উঠতো। লোকটা মেয়েবাজ। আদৌ ভাল গোয়েন্দা ছিল না। ওর জন্য সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করবেন না, আমি পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবো।

–আমি বিক্রি হব না।

–একলাখ ডলার?

না?

–দেড় লাখ?

বাদ দিন। নিজেকে বড় সস্তা করে ফেলছেন। আমাকে কেনার ধান্দা ছাড়ুন এবং আপনার ঐ ডলার সর্বস্ব মানসিকতা বাদ দিন। ফিরবো বলে দরজায় পা রাখতে বুঝি পিছনে ফেলে আসা নিস্তব্ধতা কি যন্ত্রণাদায়ক।

.

১১.

মাঝ দুপুরে টেলিফোন বেজে ওঠে।

–হ্যালো?

–কে লিউ? মর্গটের গলা। জানো, ম্যাচ ফোল্ডারটা জ্যাকুইসের।

কি করে বলছো?

–মনে পড়ল, ও আমার টেবিলের বিপরীতে বসেছিল। আমার লাইটার কাজ করছিল না। ও পকেট থেকে তার ম্যাচফোডার বের করে। টেবিলে সিগারেট–এর প্যাকেট ও ম্যাচ ফোল্ডার ফেলে জেরিসের সঙ্গে নাচে যোগ দেয়। সিগারেট ধরাতে গিয়ে আমি সেই ম্যাচ ফোল্ডার নিই ও পরে অন্যমনস্ক হয়ে সেটা ব্যাগে ভরে নিই। হলফ করে বলতে পারি টেবিলের ওপর ওকে ম্যাচ ফোল্ডার রাখতে দেখেছি। লিউ, জ্যাকুইসের সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার?

–ব্রিজিৎ সেখানে ছিলেন। তিনি যখন থ্রিসবিকে গুলি করতে যান সেই নাটকীয় মুহূর্তে আমার প্রবেশ। আমার হস্তক্ষেপে থ্রিসবি বুলেট বিদ্ধ হননি।

–বোধহয় ব্রিজিৎ মেজাজ হারিয়েছিল। কি ভাবছে লিউ, পুলিশকে জানাবে নাতো?

না। তুমি কি জান ওনার বন্দুক আছে?

–না।

–সিপ্পির খুনের ব্যাপারে ব্রিজিতের হাত আছে বলে মনে হয়?

–এখন ভাবতে পারছি না কিছু।

–কি করবে?

থ্রিসবিকে ফের ধরতে হবে। তুমি জানো ওর বাড়িতে চাকর আছে?

–হ্যাঁ, ফিলিপিন নামে একজন আছে। সকালে আসে, রাত আটটায় কাজ সেরে চলে যায়।

আবার কখন তোমার সাথে দেখা হবে মর্গট? রাত সাড়ে দশটায় চলে এসো। ইতিমধ্যে থ্রিসবির বাড়ি ঘুরে এসে তোমায় জানাবো নতুন কি খবর পেলাম।

–বেশ, যাবো। সাবধান লিউ। বাড়ির খুব কাছে গেলে জ্যাকুইস পালিয়ে যাবে। আমার কথা মনে রেখো, লোকটা হিংস্র ও ভয়ঙ্কর।

.

পিস্তলের সেফটি ক্যাচ তুলে দিই। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলি, কে ওখানে?

উত্তর নেই। বারন্দার কোণে হাঁটু গেড়ে বসা মানুষটির নাড়াচাড়ার কোন শব্দ নেই। পা কাঁপতে থাকে। অন্যমনস্ক হাত থেকে একটা বুলেট দরজা ফুড়ে ছুটে যায়। হৃৎপিণ্ড লাফাতে থাকে। চীৎকার করে বলি–দাঁড়াও! নড়ো না! এক পা নড়লেই খতম করে দেব।

ডান হাতে পিস্তল উচিয়ে, বাঁ হাতে লাইটার জ্বালাই। সেই স্বালোক বলে দেয় কোণের লোকটা নড়ছে না। কালো–খাটো মানুষটার চোখ বোজা। হাঁ মুখের কটি দাঁত দৃশ্যমান। আমার অভিজ্ঞতায় বুঝি মানুষটি মৃত। নিষ্প্রভ হতে শুরু করেছে লাইটারের আলো। আমি নিচে সিঁড়ি থেকেফাসলাইট কুড়িয়ে আনি। এই মৃত লোকটিই বোধহয় গ্রিসবির চাকর। কেউ তার বুকে গুলি করেছে। মৃতের মাথাটা ঘোরাই। ঠাণ্ডা চামড়া। চামড়ার নিচে শক্ত পেশী পরীক্ষা করে বুঝি এর মৃত্যু হয়েছে কয়েকঘন্টা আগে।

কালো বেড়ালটা আবার সামনে এসে দাঁড়ায়। ল্যাজ নেড়ে জুলজুল করে তাকায়। হাঁটতে থাকে অতি ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে পিছু ফিরে দেখে। আমি বেড়ালটাকে অনুসরণ করতে থাকি।

মৃত চাকর ফিলিপিনোকে পাশ কাটিয়ে একটা দরজার সামনে থামে বেড়ালটা। রুদ্ধ দরজায় পা দিয়ে আঁচড় কাটে।

আমি এগিয়ে গিয়ে দরজায় মৃদু চাপ দিই। খুলে যায় ভেজানো দরজা। অন্ধকার আর নিঝুম স্তব্ধতা। বেড়ালটা কান খাড়া, খাড় কাৎ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার মুখ শুকিয়ে যায়, হৃৎপিণ্ড লাফাতে থাকে, পা যেন গেঁথে যায় মাটিতে।

ঘরের মধ্যে ফ্ল্যাসলাইটের তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয় মেঝে, খাটের পায়া। লাফ দিয়ে কালো বেড়ালটা খাটের ওপর ওঠে।

থ্রিসবি পড়ে আছেন বিছানায়। পরনে লাল সর্টস সাদা জামা। পায়ে স্যান্ডাল। রক্তে বিছানা ভেসে যাচ্ছে। পিছন থেকে থ্রিসবিকে ছুরি মেরেছে আততায়ী।

ফোন করি ক্রিডির বাড়িতে, বেশ কিছুক্ষণ বাদে অপর প্রান্ত সরব হয়দুঃখিত মিস্টার ব্রান্ডন। মিসেস ক্রিডি আপনার সাথে কথা বলতে রাজি নন।

–দেখুন, মিসেস ক্রিডিকে দিন। তাকে আমার সঙ্গে কথা বলার কষ্ট করতে হবে না।

অনেক্ষণ পর মিসেস ক্রিডির গলা পাই–ফের যদি ঝামেলা করতে চান, আমি স্বামীকে গিয়ে বলবো।

খুব ভালো। তিনিও পছন্দ করবেন। আপনি বরং এখনি তাকে বলুন। কেন না, আপনি এখনি যে ঝামেলায় জড়াতে যাচ্ছেন যাতে আমার হাত নেই। প্রিসবি খুন হয়ে তার

বিছানায় পড়ে আছে। আর আপনার পয়েন্ট থার্টি এইট পিস্তল মৃতদেহের কাছে পাওয়া গেছে।

মিথ্যে কথা।

–বেশ তাই ভাবলে গ্যাট হয়ে বসে থাকুন যতক্ষণ না আইনের জালে জড়িয়ে পড়েন। আমি খবর দিচ্ছি পুলিশকে।

ভীত শাসরুদ্ধ কণ্ঠে ব্রিজিৎ বলেন–সত্যি মারা গেছে?

পুরোপুরি। আজ পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?

–এখানে নিজের ঘরে।

–কেউ দেখেছে আপনাকে?

না, আমি একা ছিলাম।

–আপনার সেক্রেটারী?

চলে গিয়েছিল।

–আপনাকে যে পিস্তলটা দিয়েছিলাম সেটা কোথায়?

বেডরুমের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছি।

–আপনার জন্য করছি কেন জানি না। তবে পিস্তলটা অকুস্থল থেকে সরিয়ে নিয়েছি। মনে হয়, কেউ আপনাকে গ্রিসবির খুনী সাজাতে চাইছে। পিস্তল সরালেও গ্রিসবির গায়ে বিদ্ধ বুলেট থেকে পিস্তলের হদিস করতে পারে পুলিশ। যদিও তা করবেনা খুব সম্ভব। এখন বসে বসে ডাকুন ঠাকুরকে। ব্রিজিতের উত্তরের অপেক্ষা না করে রিসিভার নামিয়ে রাখি।

ঠিক সোয়া দশটায় বাংলোয় ফিরে আসি। পাম গাছের আড়ালে কনভার্টেবল ক্যাডিলাক, একপলক সেদিকে তাকিয়ে বাংলোর ফটকে তালা খুলি। অন্ধকারে সন্তর্পণে স্যুইচ টিপে আলো জ্বালি। কান সজাগ, হাতে উত্তোলিত বন্দুক, কোথাও কোনো শব্দ নেই। হঠাৎ অন্ধকার থেকে ভেসে আসে মর্গটের কণ্ঠস্বর।

.

১২.

গাড়ি থেকে নেমে লেফটেন্যান্ট চেঁচিয়ে ওঠেন–আপনার সঙ্গে কথা আছে ব্রান্ডন। ভেতরে আসছি আমরা।

র‍্যানকিন ভেতরে ঢুকে বলেন–স্বেচ্ছায় আসবেন, না জোর করতে হবে? আপনি এইমাত্র গ্রিসবির বাড়ি থেকে এসেছেন, বলুন, যাননি?

আমি পুলিশের গাড়িতে পিছনের সীটে বসি।

বন্দুক দিন...হঠাৎ র‍্যানকিন বলেন।

–আমার কাছে নেই। তৎক্ষণাৎ র‍্যানকিন গাড়ি থামাতে বলে প্রশ্ন করেন–কোথায়?

বাংলোয়।

বাংলোর সামনে গাড়ি থামে। ক্যানডিকে যথাসম্ভব আড়াল করে ড্রয়ার খুলি। ক্যানডি বুকে আমার পয়েন্ট থার্টি এইট বন্দুক তুলে বলেন–এটা?

–হ্যাঁ।

ড্রয়ারে তাকিয়ে শিউরে উঠি। ব্রিজিতের বন্দুক উধাও।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকি। টের পাই, ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে, আমার কাছে বন্দুক নেই। র‍্যানকিন আমারটা নিয়েছে আর ব্রিজিতেরটা দিয়েছে হেল্পলকে। হেলের কথাগুলো কানে বাজে–যে কেউ যে কোনো জায়গায় আপনাকে খতম করে দিতে পারে। আপনি খুন হয়ে যেতে পারেন, কেউ সেজন্য দায়ী হবে না।

কেউ বেডরুমে সন্তর্পণে হাঁটছে। মিহি কিন্তু স্পষ্টই পদশব্দ শোনা যায়। সুইচ টিপে আলো নেভাই। কে যেন এ ঘরের দরজায় চাপ দেয়..ক্যাচ শব্দ ওঠে। পান্না ফাঁক হয়। আর তখনই ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠি–ওখানে কে আছে দাঁড়াও, নইলে খুপড়ি উড়িয়ে দেবো।

বলেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়ি, যাতে আততায়ীর গুলি মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়।

–লিউ? ...ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন মর্গট।

উঠে আলো জ্বেলে দিই। দরজায় মর্গট। মুখে আতঙ্ক, পরণে কাঁচের মত স্বচ্ছ রাত পোশাক। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। যেন এই ধুলিমলিন পৃথিবীর কেউ নয়।

–ওহ লিউ। যা ভয় পাইয়ে দিয়েছে। প্রাণ খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড়।

–আর তুমি যা করেছে তাতে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত, এখানে কি করছিলে মর্গট?

–ফিরে এলাম। তোমার জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল ডার্লিং...কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। বড় রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। অন্ধকারে অপেক্ষা করছিলাম। পুলিশ এলো, চলে গেলো। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা বলে ঘরে এসে তোমার প্রতীক্ষায় রইলাম।

তোমায় ফেলে যেতে হয়েছিল বলে দুঃখিত। ওঃ যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তাতে ভাবলাম অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে।

দুঃখিত, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠে আলো নিভতে দেখলাম। ভাবলাম তুমি হতে পারে। কিন্তু যদি তুমি না হও? ভেবে, তোমায় ডাকতে ভয় পেলাম, তাই দরজার আড়াল থেকে শুনছিলাম। তারপর তুমি যেরকম চিৎকার করে উঠলে।

আস্তে বলি–বিছানায় যাও, ঠাণ্ডা লাগবে।

সর্বাঙ্গে গভীর আশ্লেষী আমন্ত্রণ জানিয়ে মর্গট বলেন–ঠাণ্ডা লাগবেনা। আমি বিছানায় তো যাবো, তুমি?

দাঁড়াও আগে স্নান সারি, তারপর আসছি তোমার কাছে।

জামা কাপড়মুক্ত হয়ে বাথরুমে ঢুকি। দরজা ভেজিয়ে সাওয়ার খুলে দিই। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। দশ সেকেন্ড ঐভাবে থাকার পর খুব সন্তর্পণে এক ইঞ্চি দরজা ফাঁক করে বেডরুমের উদ্দেশ্যে চোখ রাখি।

আশ্চর্য। বিছানায় মর্গট নেই। যে চেয়ারে জামাকাপড় রেখেছি তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার ট্রাউজারের হিপ পকেট থেকে ম্যাচ–ফোল্ডার বের করে নিলেন। মুখে ভীতি ও মুক্তির মিশ্রণ দেখে ভারী বিশ্রী লাগে।

সাওয়ার বন্ধ করে বেডরুমে ঢুকি। ঘুরে দাঁড়িয়েছেন মর্গট। চোখ বিস্ফারিত। বুকে আটকে আছে দমকা বাতাস।

বিছানার কাছে গিয়ে মর্গটের মাথায় সুস্পষ্ট ছাপসহ বালিশ মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলি। বিছানার ওপর বালিশ চাপা হলুদ হাতলের (আইস পিক) বরফ খোঁচানো ছুরি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

মর্গট পাথরের মত নিশ্চল, হাতে ফোল্ডার, চোখে শঙ্কা।

–এ দিয়ে কার্যসিদ্ধি হবে ভেবেছো মর্গট? সত্যি কি ভেবেছো তুমি তৃতীয়বারও সফল হবে? আমার প্রশ্নাঘাতে থরথর কাপে ঠোঁট। কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় না। ছুরিটা হাতে নিই। সুচের মত ভীষণ আর ব্লেডের মতো ধারালো। শিরদাঁড়া বেয়ে হিমেল প্রবাহ বয়ে যায়। টের পাই মৃত্যুর কত কাছ থেকে বেঁচে ফিরলাম। চোখে চোখ রেখে বলি–অভিনেত্রী তুমি অদ্বিতীয়া হলেও একজন তৃতীয় শ্রেণীর মিথ্যুক তুমি।

মর্গট মাথা নাড়েন। বলতে থাকেন তুমি বুঝবেনা। ও আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছিল। আমার কাছ থেকে ম্যাচ–ফোল্ডার চুরি করেছিল আর তার ফেরতের বিনিময়ে আমায় চেয়েছিল। দেহদানে জোর করেছিল। আত্মরক্ষার জন্য তাকে আমি খুন করি।

–মর্গট এ গল্পটা আগের চেয়ে ভাল। সিপ্পি মোটেই ব্ল্যাক মেইল করেন নি। তার অনেক ত্রুটি হলেও তিনি নীচ নন এত। ব্যাপারটা আরো জটিল। অনুমান করতে পারি কি ঘটেছিল।

কিছুক্ষণ পরে মাথা নাড়েন মর্গট, চোখের জলে ভাসে...হা ড্যাড কোন উপায় ছিল না।

ক্রিডির চোয়াল শক্ত হয়–উপায় ছিল না মানে?

কর্ডেজ সম্বন্ধে ও পুলিশকে সব বলতে যাচ্ছিল। তা আমি করতে দিইনি।

–কেন? তুমি কি বলতে চাও, তুমি মাদকাসক্ত–তাই কি?

মনে হয়।

হঠাৎ সেখানে ক্রিডির আবির্ভাব হয়। কপাল থেকে চশমা খুলে তিনি মুছে দেখেন।

শোনো মর্গট, ক্রিডি বলতে থাকেন–তোমায় এখনি সেন্ট রাফাইল ছাড়তে হবে। মানিব্যাগ খুলে পেটমোটা টাকার বান্ডিল মেয়ের কোলে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন রাখো, চলে যাও। ব্রান্ডনের গাড়ি নিয়ে যাও। আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাসির কাছে চলে যাও। বুঝলে?

দৌড়ে বাংলো বাইরে আসি। পামগাছের ছায়ায় রাখা ক্রিডির কালো ক্যাডিলাকে উঠেইঞ্জিন চালু করে গাড়ি ঘুরিয়ে ধাওয়া করি আমার গাড়ির পেছনে।

বিপজ্জনক দ্রুততায় গাড়ি চালাচ্ছেন মর্গট। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশ। অবিশ্বাস্য ঝড়ের গতিতে মর্গটের গাড়ি ছুটে যায়। পুলিশ তো থ। বাঁশি বাজাতেও ভুলে যায়।

মাউন্টেন রোডে পড়েছি আমরা। আচমকা বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা এক মাতাল গাড়ি মর্গটের গাড়িকে পাশ দিয়ে ধাক্কা মেরে আমার দিকে ছুটে আসে। ব্রেক না চেপে স্টিয়ারিং ঘোরাই। এক চুলের জন্য বেঁচে যাই।

গাড়িশুদ্ধ মর্গট ডিগবাজি খেয়ে গড়াতে থাকে। টায়ারে ঘষা লেগে বুইকের পেছনে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। রাস্তার বাঁকে গাড়ি থামে।

যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হল। পুলিশের যে খুনে গাড়ি আমাকে ধাক্কা দেবার জন্য পথে নেমেছিল এবং শেষ পর্যন্ত দুর্ঘটনা ঘটলো, ঘটনাচক্রে সেই গাড়ির স্টিয়ারিং ছিল

মর্গটের হাতে। গাঢ় অন্ধকারে গাড়ির চালককে ওদের পক্ষে ঠাওর করা সম্ভব হয়নি। জানি এই স্বেচ্ছাকৃত দুর্ঘটনার পেছনে মাপকাঠি নেড়েছেন ক্রিডি। তিনি জানতেন আমার গাড়ি দেখা মাত্র পুলিশের গাড়ি ধাক্কা দিয়ে তা পিষে ফেলবে। তাই মর্গটকে সেই গাড়ি নিয়ে মাউন্টেন রোড ধরে যেতে নির্দেশ দেন। আর এভাবেই তিনি নিঃশব্দে, রাতের আঁধারে সাক্ষ্যহীন, প্রচারহীন পোয়া পুলিশী গুণ্ডা দিয়ে নিজে নষ্ট, অপদার্থ–মাদকাসক্ত ও খুনী মেয়েকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেন। ক্যাডিলাক থামিয়ে নামলাম। আর করার কিছু নেই। পুলিশের গাড়ির একটানা সাইরেন বাজছে কাছে। আমরা ফিরতে থাকি।